পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকর্ত্তার নূতন শিক্ষাধারা অনুসারে সমগ্র বিদ্যালয়ের
সপ্তম শ্রেণীর উপপাঠ্যরূপে মনোনীত, ২৩শে মার্চ্চ, ১৯৫০
আসাম ও বিহার টেক্সট্ বুক কমিটি কর্ত্তৃক উপপাঠ্যরূপে মনোনীত

'বঙ্কিম-গ্রন্থমালা'র পঞ্চম গ্রন্থ—

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

চন্দ্রশেখর

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদিত

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

পুনর্মুদ্রণ—
জ্যৈষ্ঠ,
১৩৬৪
৩

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম
এক টাকা

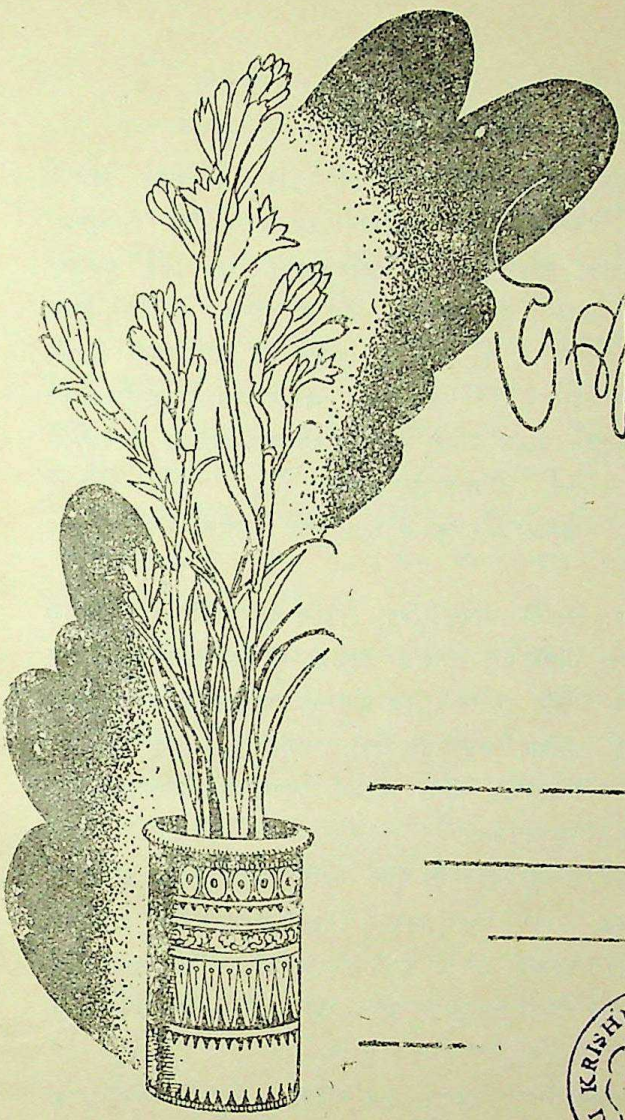

गजरा

SRI KRISHNA BOOK HOUSE
Lucknow

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী

যতদিন জগতে বাঙালী বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন বাংলাভাষা জীবিত থাকিবে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক বাঙালীর বুকে অমর হইয়া থাকিবেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে হয়তো তাঁহার অপেক্ষা প্রতিভাশালী অন্য কেহ জন্মগ্রহণ করিতে পারেন, তবুও বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার আসন সকলের উপরে থাকিবে। কারণ, তিনি যে শুধু জগতের একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী লেখক, তাহা নয়, মানব-ইতিহাসে অতি অল্প-সংখ্যক এক-জাতের লোক জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া সভ্যতার রথ আগাইয়া চলে ইংরেজীতে তাঁহাদের বলে, Pioneer, বাংলাভাষায় আমরা বলি, 'পথিকৃৎ'—যাঁহারা পথ তৈরী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সাহিত্যে এবং আমাদের জাতীয়-জীবনে সেই পথিকৃৎ।

তিনি যে পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথ ধরিয়াই আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'তিনি যে আমাদের জন্য শুধু পথ তৈয়ারী করিয়া দিয়া গেলেন, তাহা নয়, চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের অন্তরে যে সিংহাসনে বসিয়া আছেন, সেখানে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক-সম্রাটের মতন বসিয়া আছেন।

আজ হইতে একশত আঠারো বৎসর পূর্ব্বে নৈহাটীর কাছে কাঁটালপাড়া-গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন,—১৮৩৮, ২৬শে জুন। নৈহাটী ষ্টেশনের মুখে ঢুকিতেই রেল-লাইনের ধারেই ভগ্নপ্রায় তাঁহার বাড়ী চোখে পড়ে। পিছনের দিকটা ভাঙ্গিয়া জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ এই বাড়ীটিই আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম, যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি মেদিনীপুরের ডেপুটী-কলেক্টর ছিলেন। কাজ হইতে অবসর লইয়া তিনি কাঁটালপাড়াতেই

বাস করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশব সেইখানেই অতিবাহিত হয়। ছেলেবেলায় তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর তিনি 'ডবল প্রমোশন' পাইতেন—ছেলেবেলা হইতে আবৃত্তি করিতে খুব ভালবাসিতেন।

মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি সেকালের জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহার দুই বৎসর পরে তিনি সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইহার দুই বৎসর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম এনট্রান্স ও বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দলে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনিই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম বি-এ পাশ ছাত্র। বি-এ পরীক্ষার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আইন পড়িতে লাগিলেন। আইন পড়িবার সময়েই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পাইয়া যান এবং চাকরি করিতে-করিতে তিনি আইন পরীক্ষা দেন।

তাহার পর ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে তিনি বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রত্যেক জায়গাতেই বিচারক হিসাবে তাঁহার প্রচুর খ্যাতি হয়। সর্ব্বসময় তিনি আইনের মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও খাতির করিতেন না। সেখানে তিনি এতটুকু অন্যায় সুবিধা, বা, সুযোগ কাহাকেও দিতেন না। সুদীর্ঘ তেত্রিশ বৎসরকাল সগৌরবে ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি করার পর তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

হুগলী কলেজে কিশোর ছাত্ররূপে তিনি সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার তের বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় বাংলা-সাহিত্যে একজন কবি ছিলেন, তিনি সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি সে-সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। লোকে তাঁহার রসাল কবিতা ও ছড়া পড়িবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত। কিশোর বঙ্কিমচন্দ্র মনে-মনে তাঁহাকেই

গুরু বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহার মতন কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের একখানি কাগজ ছিল। সেই কাগজের নাম, 'সংবাদ-প্রভাকর'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম লেখা সেই 'সংবাদ-প্রভাকর'এ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি সবই কবিতা।

তখন বাংলা গদ্য-সাহিত্য একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যাহা ছিল, তাহার ভাষা এমন আড়ষ্ট, সংস্কৃত অনুস্বর-বিসর্গ আর সমাসের এমন ছড়াছড়ি আর মাখামাখি যে, তাহাকে সাহিত্যই বলা চলে না। তাহার মধ্যে মাত্র একজন সাহিত্যিক তখন কথ্য-ভাষায় গল্প লিখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার নাম, টেকচাঁদ ঠাকুর। সেই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ করিলেন, তাহার ভাষা-বিন্যাস এবং ভাব দেখিয়া বাঙালী বিমোহিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত এবং কথ্য-ভাষার মাঝামাঝি তিনি এমন অপরূপ এক গদ্য-ভাষা সৃষ্টি করিলেন, যাহার ছন্দে বাংলা-সাহিত্যে নূতন যুগের সৃষ্টি হইল। ভাষার যে এমন গতি থাকিতে পারে, ভাষার যে প্রাণ থাকিতে পারে, গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা ছন্দ আছে, সেই প্রথম বাংলা-সাহিত্যে তাহা প্রকাশিত হইল। তারপর নির্ঝরিণী-ধারার মত বঙ্কিমচন্দ্র একটার পর একটা উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, সীতারাম, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা প্রভৃতি একটির পর একটি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে লাগিল।

উপন্যাস ছাড়া, তিনি প্রবন্ধের মধ্য দিয়া বাঙালীর চেতনা জাগাইবার জন্য নানারকম নতুন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবন তখন ঘন-অন্ধকারে লীন। তাহার ইতিহাস নাই, জাতীয়-গৌরব সম্বন্ধে চেতনা নাই, সমাজে অসংখ্য ত্রুটি ও অন্যায়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সে পরাধীন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন,···বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেকটি ব্যাপারে আমাদের জাতীয়-চেতনাকে

জাগ্রৎ করিয়া তুলিলেন। বাঙালীর জাতীয়-জীবনের সমস্ত অভাব ও দৈন্যের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহিত্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাগিয়া উঠিল, সব দিক্ হইতে বাঙালীর চেতনাকে তিনি জাগাইয়া তুলিলেন।

তাঁহার প্রধান অসুবিধা ছিল যে, তিনি সরকারী চাকুরে। বিশেষ করিয়া সে-যুগে বৃটিশ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা, বা, করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই বিরূপ অবস্থার মধ্য হইতে তিনি এই পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিলেন, 'আনন্দমঠ' লিখিলেন, পরাধীন জাতির মুখে তাহার জাগরণ-মন্ত্রকে তুলিয়া দিলেন—"বন্দে মাতরম্!"

অন্ধকার অরণ্যের মধ্য হইতে তিনি স্বহস্তে ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া প্রশস্ত পথ তৈয়ার করিয়া দিয়া গেলেন, এবং সেই পথ ধরিয়া চলিবার জন্য রথও দিয়া গেলেন। সেই পথ ধরিয়াই আজ আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি। তাঁহার 'কমলাকান্ত' মাতৃ-রূপের যে স্বপ্ন দেখিয়া গিয়াছিল, আমাদের জীবনে আজ সে-স্বপ্ন সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। সেই সময়ের মধ্যে বিপুল রাজকার্য্য সগৌরবে সম্পন্ন করিয়া, তিনি এই জাতির পুঞ্জীভূত জঞ্জালের ভার একা স্বহস্তে সরাইয়া গিয়াছেন।

বাঙালীর নব-জন্মদাতা···সাহিত্যিক-গুরু, তোমাকে প্রণাম!

বন্দে মাতরম্!

সম্পাদকের ভূমিকা

'চন্দ্রশেখর' বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং বাংলা-সাহিত্যে এক অমর সৃষ্টি। এই কাহিনীর পিছনে যে ইতিহাসের কথা আছে, তাহা অবান্তর। শুধু কাঠামো মাত্র। আসল হইল, চন্দ্রশেখরের জীবনকে লইয়া সামাজিক কাহিনী।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যে একটি বড় আদর্শ পরিস্ফুট হইয়া আছে। শুধু কাহিনী বলার জন্য তিনি কাহিনী লেখেন নাই। জগতে যত কাব্য বা উপন্যাস লেখা হইয়াছে, তাহার মূল কথা হইল—ভালোবাসা। এই ভালোবাসা লইয়া কত সাহিত্যিক, কত-ভাবে কত কাহিনী লিখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর সেখানে একটি অপূর্ব্ব নূতন চরিত্র। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে আমাদের ঋষিরা ভালোবাসাকে যেভাবে দেখিয়াছেন, চন্দ্রশেখর-চরিত্রের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজ-ব্যবস্থায় সংযমকে সব-চেয়ে বড় উঁচু জায়গা দেওয়া হইয়াছে। চন্দ্রশেখর-চরিত্রে এবং উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

উপক্রমণিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বালক-বালিকা

ভাগীরথীতীরে আম্রকাননে বসিয়া একটি বালক ভাগীরথীর সান্ধ্য-জলকল্লোল শ্রবণ করিতেছিল। তাহার পদতলে নবদূর্ব্বাশয্যায় শয়ন করিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া ছিল—চাহিয়া, চাহিয়া, চাহিয়া আকাশ, নদী, বৃক্ষ দেখিয়া আবার সেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালকের নাম—প্রতাপ, বালিকার নাম—শৈবলিনী। শৈবলিনী তখন সাত-আট বৎসরের বালিকা—প্রতাপ কিশোরবয়স্ক।

মাথার উপরে শব্দতরঙ্গে আকাশমণ্ডল ভাসাইয়া পাপিয়া ডাকিয়া গেল। শৈবলিনী, তাহার অনুকরণ করিয়া, গঙ্গাকূলবিরাজী আম্রকানন কম্পিত করিতে লাগিল। গঙ্গার তর-তর রব সে ব্যঙ্গ-সঙ্গীত সঙ্গে মিলাইয়া গেল।

বালিকা, ক্ষুদ্র করপল্লবে বন্যকুসুম চয়ন করিয়া, মালা গাঁথিয়া বালকের গলে পরাইল। আবার খুলিয়া লইয়া আপন কবরীতে পরাইল, আবার খুলিয়া বালকের গলায় পরাইল। স্থির হইল না—কে মালা পরিবে। নিকটে হৃষ্টা-পুষ্টা একটি গাই চরিতেছে দেখিয়া, শৈবলিনী বিবাদের মালা তাহার শৃঙ্গে পরাইয়া আসিল; তখন বিবাদ মিটিল। এইরূপ ইহাদের সর্ব্বদা হইত। কখনো-বা মালার বিনিময়ে

বালক নীড় হইতে পক্ষিশাবক পাড়িয়া দিত, আম্রের সময় সুপক্ক আম্র পাড়িয়া দিত।

সন্ধ্যার কোমল আকাশে তারা উঠিলে, উভয়ে তারা গণিতে বসিল। কে আগে দেখিয়াছে? কোন্‌টি আগে উঠিয়াছে? তুমি কয়টা দেখিতে পাইতেছ? চারিটা? আমি পাঁচটা দেখিতেছি। ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা। মিথ্যা কথা। শৈবলিনী তিনটা বৈ দেখিতেছে না।

নৌকা গোণো। কয়খানা নৌকা যাইতেছে বলো দেখি? ষোলোখানা? বাজি রাখো—আঠারোখানা। শৈবলিনী গণিতে জানিত না, একবার গণিয়া নয়খানা হইল, আর-একবার গণিয়া একুশ-খানা হইল। তারপর গণনা ছাড়িয়া, উভয়ে একাগ্রচিত্তে একখানি নৌকার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল। নৌকায় কে আছে—কোথা যাইবে—কোথা হইতে আসিল? দাঁড়ের জলে কেমন সোনা জ্বলিতেছে!···

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ডুবিল-বা কে, উঠিল-বা কে ?

এইরূপে ভালোবাসা জন্মিল। ষোলো বৎসরের নায়ক—আট বৎসরের নায়িকা। বালকের ন্যায় কেহ ভালোবাসিতে জানে না।

শৈবলিনী মনে-মনে জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতি-কন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।

শৈবলিনী—দরিদ্রের কন্যা। কেহ ছিল না, কেবল মাতা। তাহাদের কিছু ছিল না, কেবল একখানি কুটীর, আর শৈবলিনীর রূপরাশি। প্রতাপও দরিদ্র।

শৈবলিনী বাড়িতে লাগিল, কিন্তু বিবাহ হয় না। বিবাহের ব্যয় আছে—কে ব্যয় করে ? সে অরণ্যমধ্যে সন্ধান করিয়া কে সে রূপরাশি অমূল্য বলিয়া তুলিয়া লইয়া আসিবে ?

পরে শৈবলিনীর জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। বুঝিল যে, প্রতাপ ভিন্ন পৃথিবীতে সুখ নাই। বুঝিল, এ-জন্মে প্রতাপকে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

দুইজনে পরামর্শ করিতে লাগিল। পরামর্শ করে, কেহ জানিতে পারে না। পরামর্শ ঠিক হইলে দুইজনে গঙ্গাস্নানে গেল। গঙ্গায় অনেকে সাঁতার দিতেছিল। প্রতাপ বলিল,—"আয় শৈবলিনি ! সাঁতার দিই।"

দুইজনেই সাঁতার দিতে আরম্ভ করিল। সন্তরণে দুইজনেই পটু—তেমন সাঁতার দিতে গ্রামের কোনো ছেলেই পারিত না। বর্ষাকাল। কূলে-কূলে গঙ্গার জল,—জল দুলিয়া-দুলিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া, ছুটিয়া-ছুটিয়া যাইতেছে। দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া, মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া সাঁতার দিয়া চলিল। সাঁতার দিতে-দিতে ইহারা অনেক দূর গেল দেখিয়া, ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা ডাকিয়া ফিরিতে বলিল। তাহারা শুনিল না, চলিল। আবার সকলে ডাকিল—তিরস্কার করিল—দুইজনের কেহ শুনিল না—চলিল। অনেক দূর গিয়া প্রতাপ বলিল,—"শৈবলিনি, এই আমাদের বিয়ে।"

শৈবলিনী বলিল, "আর কেন, এইখানেই।"

প্রতাপ ডুবিল।

শৈবলিনী ডুবিল না। সেইসময়ে শৈবলিনীর ভয় হইল, মনে ভাবিল—কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না। শৈবলিনী ডুবিল না, সন্তরণ করিয়া কূলে ফিরিয়া আসিল।

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর মিলিল

যেখানে প্রতাপ ডুবিয়াছিল, তাহার অনতিদূরে একখানি পান্সী বাহিয়া যাইতেছিল। নৌকারোহী একজন দেখিল—প্রতাপ ডুবিল। সে লাফ দিয়া জলে পড়িল। নৌকারোহী—চন্দ্রশেখর শর্ম্মা।

চন্দ্রশেখর সন্তরণ করিয়া, প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। তাহাকে নৌকায় লইয়া তীরে নৌকা লাগাইলেন। সঙ্গে করিয়া প্রতাপকে তার গৃহে রাখিতে গেলেন।

প্রতাপের মাতা ছাড়িলেন না, চন্দ্রশেখরের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া, সেদিন তাঁহাকে আতিথ্য স্বীকার করাইলেন। চন্দ্রশেখর ভিতরের কথা কিছু জানিলেন না।

শৈবলিনী প্রতাপকে আর মুখ দেখাইল না। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখিলেন। দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন।

চন্দ্রশেখর তখন নিজে একটু বিপদ্‌গ্রস্ত। তিনি বত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি গৃহস্থ, অথচ সংসারী নহেন। এ-পর্য্যন্ত দারপরিগ্রহ করেন নাই, দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি বৎসরাধিককাল গত হইল, তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল। তাহাতে দারপরিগ্রহ না করাই জ্ঞানার্জ্জনের বিঘ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! প্রথমত, স্বহস্তে পাক করিতে হয়, তাহাতে অনেক সময় যায়;

অধ্যয়ন-অধ্যাপনার বিঘ্ন ঘটে। দ্বিতীয়ত, দেব-সেবা আছে, ঘরে শালগ্রাম আছেন। সেই সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়, তাহাতে কালাপহৃত হয়,—দেবতার সেবায় সুশৃঙ্খলা ঘটে না—গৃহকর্ম্মে বিশৃঙ্খলা ঘটে,—এমন কি, সকল দিন আহারের ব্যবস্থা হইয়া উঠে না। পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না। প্রাপ্ত অর্থ কোথায় রাখেন, কাহাকে দেন, মনে থাকে না। খরচ নাই, অথচ অর্থে কুলায় না। চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোনো-কোনো দিকে সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু যদি বিবাহ করি, তবে সুন্দরী বিবাহ করা হইবে না।

মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন শৈবলিনীর সঙ্গে চন্দ্রশেখরের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রতভঙ্গ হইল।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছু ইতস্তত করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন।

এই বিবাহের আট বৎসরের পর এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইতেছে।

———

চন্দ্রশেখর

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

দলনী বেগম

সুবে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার অধিপতি নবাব আলিজা মীর কাসেম খাঁ, মুঙ্গেরের দুর্গে বসতি করেন। দুর্গমধ্যে, অন্তঃপুরে, রঙ্গমহলে একস্থানে বড় শোভা। রাত্রির প্রথম প্রহর এখনও অতীত হয় নাই।

গৃহমধ্যে বসিয়া একটি সুন্দরী যুবতী বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছিলেন। এমন সময়ে নিকটস্থ প্রহরীর অভিবাদন-শব্দ এবং বাহকদিগের পদধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বালিকা দ্বারে গিয়া দেখিলেন, নবাবের তাঞ্জাম। নবাব মীর কাসেম আলি খাঁ তাঞ্জাম হইতে অবতরণপূর্ব্বক এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

নবাব আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দলনী বিবি, কি গীত গাহিতেছিলে? তুমি যাহা গাহিতেছিলে, গাও।"

বীণার তার অবাধ্য হইল—কিছুতেই সুর বাঁধে না।

তখন দলনী সহসা বীণা ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমি গায়িব না।"

নবাব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? রাগ না কি?"

দ। কলিকাতায় ইংরেজরা যে-বাজনা বাজাইয়া গীত গায়, তাহাই একটি আনাইয়া দেন, তবেই আপনার সম্মুখে পুনর্ব্বার গীত গায়িব, নহিলে আর গায়িব না।

মীর কাসেম হাসিয়া বলিলেন, "যদি সে-পথে কাঁটা না পড়ে, অবশ্য দিব।"

দ। কাঁটা পড়িবে কেন ?

নবাব দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "বুঝি তাঁহাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি কি সে-সকল কথা শুন নাই ?"

দলনী বলিলেন, "শুনিয়াছি। আপনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, যে ইংরেজদিগের সঙ্গে বিবাদ করিবে, সেই হারিবে—তবে কেন আপনি তাহাদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে চাহেন ?"

মীর কাসেম কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমার আর উপায় নাই। যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে সে-রাজ্য ত্যাগ করিব, অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব ? আমি সিরাজ-উদ্দৌলা নহি।"

দলনী বলিলেন, "কিন্তু, আমার একটি ভিক্ষা আছে। আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন না।"

মীর-কা। এ-বিষয়ে কি বাঙ্গালার নবাবের কর্ত্তব্য যে স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনে ? না, বালিকার কর্ত্তব্য যে, এ-বিষয়ে পরামর্শ দেয় ?

দলনী অপ্রতিভ হইলেন, ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, "আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলিয়াই এ-সকল কথা বলিয়াছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।"

"কি ?"

"আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লইয়া যাইবেন ?"

মীর কাসেম কিছুতেই সম্মত হইলেন না।

...সুন্দরী কহিল, "আমার জন্য ভাবিও না। তুমি যাও, যে প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব।"

[পৃষ্ঠা—২৩

দলনী তখন ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আপনি গণিতে জানেন ; বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব ?"

মীর কাসেম হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিলেন, শিক্ষামত অঙ্ক পাতিয়া দেখিলেন।

দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দেখিলেন ?"

মীর কাসেম বলিলেন, "যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।"

নবাব তখনই বাহিরে আসিয়া, মীর মুন্সীকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, "মুরশিদাবাদের অনতিদূরে বেদগ্রাম নামে যে স্থান আছে—তথায় চন্দ্রশেখর নামে একজন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করে—সে আমাকে গণনা শিখাইয়াছিল—তাহাকে ডাকাইয়া গণাইতে হইবে যে, যদি সম্প্রতি ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তবে যুদ্ধকালে এবং যুদ্ধপরে—দলনী বেগম কোথায় থাকিবে ?"

মীর মুন্সী তাহাই করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভীমা পুষ্করিণী

ভীমা নামে বৃহৎ পুষ্করিণীর চারিধারে ঘন-ঘন তালগাছের সারি। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রৌদ্র পুষ্করিণীর কালো জলে পড়িয়াছে ; কালো জলে রৌদ্রের সঙ্গে তালগাছের কালো ছায়া সকল অঙ্কিত হইয়াছে। সেই আবৃত অল্পান্ধকার মধ্যে শৈবলিনী এবং সুন্দরী ধাতুকলসী হস্তে জলের সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল।

সুন্দরী বলিল, "ভাই, সন্ধ্যা হইল, আর এখানে না। চল, বাড়ী যাই।"

শৈ। আমি উঠবনা—তুই যা।

সুন্দরী রাগ করিয়া কলসী পূর্ণ করিয়া কূলে উঠিল। পুনর্ব্বার শৈবলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "হাঁ লো, সত্যি-সত্যি তুই কি এই সন্ধ্যাবেলা একা পুকুরঘাটে থাকিবি না কি?"

শৈবলিনী কোন উত্তর করিলেন না! অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। সুন্দরী আর কথা না কহিয়া, কক্ষ হইতে কলস ভূমে নিক্ষেপ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

সুন্দরী একটি ইংরেজ দেখিতে পাইয়াছিল।

ইংরেজকে দেখিয়া শৈবলিনী হেলিলেন না—দুলিলেন না—জল হইতে উঠিলেন না।

সুন্দরী পলাইয়া গেল, কেহ নাই দেখিয়া ইংরেজ ধীরে-ধীরে তালগাছের অন্তরালে-অন্তরালে থাকিয়া, ঘাটের জলের নিকট আসিয়া বলিলেন, "I come again."

শৈবলিনী বলিলেন, "আমি ও ছাই বুঝিতে পারি না।"

ইংরেজ। হম্ again আয়া হ্যায়।

শৈ। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ইংরেজ বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "কিয়া বোল্‌তা হ্যায়?"

শৈ। যম কি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে?

ইংরেজ। যম? John you mean? হম্ জন্ নহি, হম্—লরেন্স।

শৈ। ভাল, একটা ইংরেজি কথা শিখিলাম—লরেন্স মানে, বাঁদর।

সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফষ্টর কতকগুলি দেশী গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল। শৈবলিনী ধীরে-ধীরে জলকলস পূর্ণ করিয়া মন্দপদে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যথাস্থানে জল রাখিয়া শয্যাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

তথায় শৈবলিনীর স্বামী চন্দ্রশেখর মৃৎপ্রদীপ-সম্মুখে তুলটে হাতে-লেখা পুঁথি পড়িতেছিলেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তাহার পর এক শত বৎসর অতীত হইয়াছে।

চন্দ্রশেখরের বয়ঃক্রম প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষ। তাঁহার আকার দীর্ঘ; তদুপযোগী বলিষ্ঠ গঠন। মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত—তদুপরি চন্দন-রেখা। শৈবলিনী গৃহ-প্রবেশকালে মনে-মনে ভাবিতেছিলেন, "যখন ইনি জিজ্ঞাসা করিবেন, কেন এত রাত্রি হইল, তখন কি বলিব?" কিন্তু শৈবলিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, চন্দ্রশেখর কিছু বলিলেন না।

শৈবলিনী বলিলেন, "আমি ভাবিতেছি, না জানি আমায় তুমি কত বকিবে। আমার পুকুরঘাট হইতে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, তাই।"

চন্দ্র। বটেও ত'—এখন এলে নাকি? বিলম্ব হইল কেন?

শৈ। একটা গোরা আসিয়াছিল। তা, সুন্দরী-ঠাকুরঝি তখন ডাঙ্গায় ছিল, আমায় ফেলিয়া দৌড়িয়া পলাইয়া আসিল। আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।

চন্দ্রশেখর অন্যমনে বলিলেন, "আর আসিও না।" এই বলিয়া আবার শাঙ্করভাষ্যে মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি অত্যন্ত গভীরা হইল। তখনও চন্দ্রশেখর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। শৈবলিনী প্রথামত স্বামীর অন্নব্যঞ্জন তাঁহার নিকট রক্ষা

করিয়া, আপনি আহারাদি করিয়া, পার্শ্বস্থ শয্যোপরি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

পরদিন প্রাতে মীর মুন্সীর নিকট হইতে সংবাদ আসিল, চন্দ্রশেখরকে মুরশিদাবাদ যাইতে হইবে। নবাবের কাজ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লরেন্স ফষ্টর

বেদগ্রামের অতি নিকটে পুরন্দরপুর নামক গ্রামে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের একটি ক্ষুদ্র কুঠি ছিল। লরেন্স ফষ্টর তথাকার ফ্যাক্টর, বা কুঠিয়াল।

পরে অকস্মাৎ কলিকাতা হইতে ফষ্টরের প্রতি আজ্ঞা প্রচার হইল যে, "পুরন্দরপুরের কুঠিতে অন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে, তুমি শীঘ্র কলিকাতা আসিবে। তোমাকে কোন বিশেষ কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে।"

লরেন্স ফষ্টর যেদিন কলিকাতা যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে সন্ধ্যার পর শিবিকা, বাহক, কুঠির কয়জন বরকন্দাজ লইয়া সশস্ত্র বেদগ্রাম যাত্রা করিলেন।

সেই রাত্রে বেদগ্রামবাসীরা সভয়ে শুনিল যে, চন্দ্রশেখরের গৃহে ডাকাইতি হইতেছে। চন্দ্রশেখর সেদিন গৃহে ছিলেন না, মুরশিদাবাদ হইতে রাজকর্ম্মচারীর সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র প্রাপ্ত হইয়া তথায় গিয়াছিলেন—অদ্যাপি প্রত্যাগমন করেন নাই।

গ্রামবাসীরা চীৎকার, কোলাহল, বন্দুকের শব্দ এবং রোদনধ্বনি

শুনিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রশেখরের বাড়ী ডাকাতি হইতেছে, অনেক মশালের আলো। কেহ অগ্রসর হইল না। তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, বাড়ী লুটিয়া ডাকাতেরা একে-একে নির্গত হইল; বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, কয়েকজন বাহকে একখানি শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ—সঙ্গে পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব! দেখিয়া সকলে সভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দস্যুগণ চলিয়া গেলে, প্রতিবাসীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; দেখিল, দ্রব্যসামগ্রী বড় অধিক অপহৃত হয় নাই—অধিকাংশই আছে। কিন্তু শৈবলিনী নাই।

কেহ-কেহ বলিল, "সে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনই আসিবে।" প্রাচীনেরা বলিল, "আর আসিবে না—যে পাল্কী দেখিলে, ঐ পাল্কীমধ্যে সে গিয়াছে।" যাহারা প্রত্যাশা করিতেছিল যে, শৈবলিনী আবার ফিরিয়া আসিবে, তাহারা দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া শেষে বসিল, বসিয়া-বসিয়া নিদ্রায় ঢুলিতে লাগিল, ঢুলিয়া-ঢুলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। শৈবলিনী আসিল না।

সুন্দরী নামে যাহাকে আমরা পরিচিতা করিয়াছি, সে-ই সকলের শেষে উঠিয়া গেল।

সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীর কন্যা, সম্বন্ধে তাঁহার ভগিনী; শৈবলিনীর সখী। আবার তাহার কথা উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়া, এস্থলে এ-পরিচয় দিলাম।

সুন্দরী বসিয়া-বসিয়া, প্রভাতে গৃহে গেল, গৃহে গিয়া কাঁদিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নাপিতানী

ফষ্টর স্বয়ং শিবিকা লইয়া দূরবর্ত্তিনী ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আসিলেন। সেখানে নৌকা সুসজ্জিত ছিল। শৈবলিনীকে নৌকায় তুলিলেন। নৌকায় হিন্দু দাসদাসী এবং প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

ফষ্টর নিজে অন্য যানে কলিকাতায় গেলেন। তাঁহাকে শীঘ্র যাইতে হইবে—বড় নৌকায় বাতাস ঠেলিতে ঠেলিতে সপ্তাহে কলিকাতায় যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। শৈবলিনীর নৌকা মুঙ্গেরে যাইতে বলিয়া গেলেন।

ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর আরোহণ করিয়া শৈবলিনীর সুবিস্তৃতা তরণী উত্তরাভিমুখে চলিল—অল্প বেলা হইলেই বায়ু প্রবল হইল। বড় নৌকা প্রতিকূল বায়ুতে আর চলিল না; রক্ষকেরা ভদ্রহাটীর ঘাটে নৌকা রাখিল।

ক্ষণকাল পরে নৌকার কাছে এক নাপিতানী আসিল। নাপিতানী সধবা, খাটো রাঙাপেড়ে শাড়ী-পরা—হাতে আলতার চুবড়ী। রক্ষকদিগের অনুমতি লইয়া দাসী, নাপিতানীকে নৌকার ভিতর পাঠাইয়া দিল।

নাপিতানী শৈবলিনীকে দেখিয়া আর-একটু ঘোমটা টানিয়া দিল এবং তাহার একটি চরণ লইয়া আলতা পরাইতে লাগিল। শৈবলিনী কিয়ৎকাল নাপিতানীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—নাপিতানী, তুমি কাঁদছ?"

নাপিতানী মৃদুস্বরে বলিল, "না।"

"হাঁ, কাঁদছ।" বলিয়া শৈবলিনী নাপিতানীর অবগুণ্ঠন মোচন

করিয়া দিলেন। নাপিতানী কাঁদিতেছিল। অবগুণ্ঠন মুক্ত হইলে নাপিতানী একটু হাসিল।

নাপিতানী আর কেহ নহে—সুন্দরী-ঠাকুরঝি। সুন্দরী চক্ষের জল মুছিয়া কহিল, "শীঘ্র যাও। আমার এই শাড়ী পরো, ছাড়িয়া দিতেছি। এই আলতার চুবড়ী নাও। ঘোমটা দিয়া, নৌকা হইতে চলিয়া যাও।"

শৈবলিনী বিমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এলে কেমন ক'রে ?"

সু। তোমার সন্ধানে এখানে আসিয়াছি। লোকে বলিল, পাল্কী—গঙ্গার পথে গিয়াছে। আমিও প্রাতে উঠিয়া কাহাকে কিছু না বলিয়া হাঁটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলাম। লোকে বলিল, বজরা উত্তরমুখে গিয়াছে। অনেক দূর, পা ব্যথা হইয়া গেল। তখন নৌকা ভাড়া করিয়া তোমার পাছে-পাছে আসিয়াছি। তোমার বড় নৌকা—চলে না, আমার ছোট নৌকা, তাই শীঘ্র আসিয়া ধরিয়াছি। আমার স্বামী আমার সঙ্গে আছেন। আমাদের ডিঙ্গি একটু দূরে রাখিয়া আমি নাপিতানী সাজিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার এই শাড়ী পরো, এই আলতার চুবড়ী নাও, ঘোমটা দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া যাও, কেহ চিনিতে পারিবে না। তীরে-তীরে যাইবে। ডিঙ্গিতে আমার স্বামীকে দেখিবে। নন্দাই বলিয়া লজ্জা করিও না —ডিঙ্গিতে উঠিয়া বসিও। তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গি খুলিয়া দিয়া, তোমায় বাড়ী লইয়া যাইবেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তারপর, তোমার দশা ?"

সু। আমার জন্য ভাবিও না। তুমি যাও, যে-প্রকারে হয়, আমি রাত্রিমধ্যে বাড়ী যাইব।

শৈবলিনী একটু নীরব হইয়া রহিলেন। একটু কাঁদিলেন, চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন, "আমি যাইব—আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু আমার কলঙ্ক কি কখনও ঘুচিবে? মরিতে হয়, নাহয় মরিব; মরণ ত' হাতেই আছে। এখন আমার মরণ বই আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না। তুমি অনর্থক আমার জন্য এত ক্লেশ করিলে, ফিরিয়া যাও। আমি যাইব না, মনে করিও, আমি মরিয়াছি।"

তখন সুন্দরী রোদন সংবরণ করিয়া গাত্রোত্থান করিল; বলিল, "ভরসা করি, তুমি শীঘ্র মরিবে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মরিতে তোমার সাহস হয়। মুঙ্গেরে পৌঁছিবার আগে যেন তোমার মৃত্যু হয়।"

এই বলিয়া সুন্দরী নৌকামধ্য হইতে নিক্রান্ত হইয়া, আলতার চুবড়ী জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া স্বামীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রশেখরের প্রত্যাগমন

চন্দ্রশেখর ভবিষ্যৎ গণিয়া দেখিলেন; দেখিয়া রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি নবাবকে জানাইবেন, আমি গণিতে পারিলাম না।"

রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মহাশয়!"

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "সকল কথা গণনায় স্থির হয় না।"

রাজপুরুষ বলিলেন, "অথবা রাজার অপ্রিয় সংবাদ বুদ্ধিমান লোকে

প্রকাশ করে না। যাহাই হউক, আপনি যেমন বলিলেন, আমি সেইরূপ রাজসমীপে নিবেদন করিব।"

চন্দ্রশেখর বিদায় হইলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিতে, দূর হইতে চন্দ্রশেখর নিজ গৃহ দেখিতে পাইলেন। কোনদিকে না চাহিয়া আপন গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

দ্বার রুদ্ধ। বাহির হইতে দ্বার ঠেলিলে, ভৃত্য বহির্বাটীর দ্বার খুলিয়া দিল। চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া ভৃত্য কাঁদিয়া উঠিল। চন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

ভৃত্য কিছু উত্তর না করিয়া, কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেল।

চন্দ্রশেখর মনে-মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন। দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট পড়ে নাই—চণ্ডীমণ্ডপে ধূলা। স্থানে-স্থানে পোড়া মশাল, স্থানে-স্থানে কবাট ভাঙা।

তখন চন্দ্রশেখর প্রাঙ্গণমধ্যে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিকৃতকণ্ঠে ডাকিলেন, "শৈবলিনি!"

কেহ উত্তর দিল না।

ততক্ষণ শৈবলিনীর চিত্রিত-তরণীর উপর ইংরেজের লাল নিশান উড়িতেছিল—মাঝিরা সারি গাহিতেছিল।

* * * *

চন্দ্রশেখর সকল শুনিলেন।

তখন চন্দ্রশেখর সযত্নে গৃহ-প্রতিষ্ঠিত শালগ্রামশিলা সুন্দরীর পিতৃগৃহে রাখিয়া আসিলেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বিতরণ করিলেন। সায়াহ্নকালে আপনার অধীত, অধ্যয়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি একে-একে

আনিয়া একত্র করিলেন। সকলগুলি প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া সাজাইলেন। সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করিলেন।

অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে-ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; সেই অমূল্য গ্রন্থরাশি ভস্মাবশেষ হইয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহরে গ্রন্থদাহ সমাপন করিয়া চন্দ্রশেখর উত্তরীয় মাত্র গ্রহণ করিয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া গেলেন, কোথায় গেলেন, কেহ জানিল না—কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুল্‌সম্‌

"না, চিড়িয়া নাচিবে না। তুই এখন তোর গল্প বল্।"

দলনী বেগম এই বলিয়া, যে ময়ূরটা নাচিল না, তাহার পুচ্ছ ধরিয়া টানিলেন।

নিকটে এক পরিচারিকা পক্ষীদিগকে নাচাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহাকেই দলনী বলিলেন, "এখন তোর গল্প বল্।"

কুল্‌সম্‌ কহিল, "গল্প আর কি? হাতিয়ার-বোঝাই দুইখানি কিস্তি ঘাটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহাতে একজন ইংরেজ

চড়নদার। সেই দুই কিস্তি আটক হইয়াছে। আলি ইব্রাহিম খাঁ বলেন যে, 'নৌকা ছাড়িয়া দাও, উহা আটক করিলেই খামকা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই বাধিবে!' গুর্‌গন্ খাঁ বলেন, 'লড়াই বাধে বাধুক, নৌকা ছাড়িব না'।"

দ। হাতিয়ার কোথায় যাইতেছে?

কু। আজিমাবাদের (পাটনা) কুঠিতে যাইতেছে। লড়াই বাধে ত' আগে সেইখানেই বাধিবে।

দ। তা, গুর্‌গন্ খাঁ আটক করিতে চাহে কেন?

কু। বলে, সেখানে এত হাতিয়ার জমিলে লড়াই ফতে করা ভার হইবে। শত্রুকে বাড়িতে দেওয়া ভাল নহে।

দলনী অনেকক্ষণ চিন্তিত হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "কুল্‌সম্, তুই একটি দুঃসাহসের কাজ করতে পারিস্?"

কু। কি? ইলিস মাছ খেতে হবে, না, ঠাণ্ডা জলে নাইতে হবে?

দ। দূর! তামাসা নহে। একবার গুর্‌গন্ খাঁর কাছে একখানি পত্র পাঠাইতে হইবে।

কুল্‌সম্ বিস্ময়ে নীরব হইল। দলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিস্?"

কু। পত্র কে দিবে?

দ। আমি।

কু। সে কি? তুমি কি পাগল হইয়াছ?

দ। প্রায়।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। তাহাদিগকে নীরব দেখিয়া ময়ূর

দুইটি যাইয়া আপন-আপন বাসযষ্টিতে আরোহণ করিল। কাকাতুয়া অনর্থক চীৎকার আরম্ভ করিল। অন্যান্য পক্ষী আহারে মন দিল।

কিছুক্ষণ পরে কুল্‌সম্‌ বলিল, "কাজ অতি সামান্য, একজন খোজাকে কিছু দিলেই সে এখনই পত্র দিয়া আসিবে। কিন্তু এ-কাজ বড় শক্ত। নবাব জানিতে পারিলে, উভয়ে মরিব। যাই হোক, তোমাদের কর্ম্ম তুমি জান, আমি দাসী, পত্র দাও আর কিছু নগদ দাও।"

পরে কুল্‌সম্‌ পত্র লইয়া গেল। এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা—দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গুরগন্‌ খাঁ

যাহার কাছে দলনীর পত্র গেল, তাহার নাম গুরগন্‌ খাঁ।

এইসময়ে বাঙ্গালায় যে-সকল রাজপুরুষ নিযুক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে গুরগন্‌ খাঁ একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; তিনি জাতিতে আরমানি, ইস্পাহান তাঁহার জন্মস্থান ; রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তিনি অল্পকাল-মধ্যে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কিন্তু গুরগন্‌ খাঁ শয়ন করেন নাই। একাকী দীপালোকে কতকগুলি পত্র পড়িতেছিলেন।

পত্র পাঠ করিয়া গুরগন্‌ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন। চোপ্‌দার আসিয়া দাঁড়াইল, গুরগন্‌ খাঁ বলিলেন, "সব দ্বার খোলা আছে ?"

চোপ্‌দার কহিল, "আছে।"

গুর্। যদি কেহ এখন আমার নিকট আইসে—তবে কেহ তাহাকে বাধা দিবে না, বা জিজ্ঞাসা করিবে না, তুমি কে ?

চোপ্‌দার কহিল, "হুকুম তামিল হইয়াছে।"

গুর্। আচ্ছা, তুমি তফাতে থাকো।

তখন গুর্‌গন্ খাঁ পত্রাদি বাঁধিয়া উপযুক্ত স্থানে লুক্কায়িত করিলেন। মনে-মনে বলিতে লাগিলেন—এখন মীর কাসেম মসনদে থাক, তাহার সহায় হইয়া বাঙ্গালা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব। সেইজন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীর কাসেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ।

বলিতে-বলিতে যাঁহার কথা ভাবিতেছিলেন, তিনি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। গুর্‌গন্ খাঁ তাঁহাকে পৃথক্ আসনে বসাইলেন। তিনি দলনী বেগম।

গুর্‌গন্ খাঁ কহিলেন, "তুমি এ দুঃসাহসিক কাজ কেন করিলে ? নবাবের বেগম হইয়া রাত্রে গোপনে একাকিনী চুরি করিয়া আমার নিকট আসিয়াছ, ইহা নবাব জানিতে পারিলে তোমাকে-আমাকে দুইজনকে বধ করিবেন !"

দ। যদি তিনি জানিতেই পারেন, তখন আপনাতে-আমাতে যে সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ করিব।

গুর্। তুমি বালিকা, তাই এমন ভরসা করিতেছ। এতদিন আমরা এ-সম্বন্ধ প্রকাশ করি নাই। এখন বিপদে পড়িয়া প্রকাশ করিলে কে বিশ্বাস করিবে ?

দ। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি আসিয়াছি। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হইবে, এ-কথা কি সত্য ?

গুর্। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার-আমার ক্ষতি কি? হয়, হউক না।

দ। আমার মনে হইতেছে যে, কোনমতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইব না। এ-যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব আমি মিনতি করিতে আসিয়াছি, আপনি এ-যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিবেন না। আমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বলিয়া দলনী বেগম রোদন করিতে লাগিলেন।

গুর্গন্ খাঁ বিস্মিত হইলেন; বলিলেন, "তুমি কাঁদো কেন? নাহয় মীর কাসেম সিংহাসনচ্যুত হইবেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।"

ক্রোধে দলনীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সক্রোধে তিনি বলিলেন, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীর কাসেম আমার স্বামী? অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালোই, নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু-সম্বন্ধ।" এই বলিয়া দলনী বেগম বেগে পুরী হইতে বহির্গতা হইয়া গেলেন।

দলনী বাহির হইলে গুর্গন্ খাঁ চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝিলেন যে, অতএব আর উহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। গুর্গন্ খাঁ ভৃত্যকে ডাকিলেন।

একজন শস্ত্রবাহক উপস্থিত হইল। গুর্গন্ খাঁ তাহার দ্বারা আজ্ঞা পাঠাইলেন, দলনীকে প্রহরীরা যেন দুর্গে প্রবেশ করিতে না দেয়।

দলনী যথাকালে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই অন্ধকার রাত্রে রাজপথে দাঁড়াইয়া দলনী কাঁদিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দলনীর কি হইল?

একমাত্র পরিচারিকা সঙ্গে, নিশাকালে রাজমহিষী রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কুল্‌সম্ জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিবে?"

দলনী চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "আইস, এই বৃক্ষতলে দাঁড়াই, প্রভাত হউক।"

কু। এখানে প্রভাত হইলে আমরা ধরা পড়িব।

দ। তাহাতে ভয় কি? আমি কোন্ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি যে, ভয় করিব?

কু। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কেন আসিয়াছি তা তুমিই জানো। কিন্তু লোকে কি মনে করিবে, নবাবই-বা কি মনে করিবেন, তাহা ভাবিয়া দেখ।

দ। যাহাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা—আমি অন্য বিচার মানি না। নাহয় মরিব, ক্ষতি কি?

এই সময়ে উভয়ে সভয়ে দেখিলেন, অন্ধকারে এক দীর্ঘাকার পুরুষমূর্ত্তি আশ্রয়বৃক্ষের অভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

দীর্ঘাকার পুরুষ সেইখানে আসিলেন। বলিলেন, "এখানে তোমরা কে ?"

দীর্ঘাকার পুরুষটির কণ্ঠস্বর অতি মধুর—দুঃখ এবং দয়ায় পরিপূর্ণ। স্ত্রীলোকদিগের ভয় দূর হইল। কুল্‌সম্‌ কহিল, "আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে ?"

পু। এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ ?

তখন দলনী বলিলেন, "আমরা হতভাগিনী—আপনি কে ?"

আগন্তুক কহিলেন, "আমি সামান্য ব্যক্তি—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র। ব্রহ্মচারী।"

দ। আপনি যেই হউন, আপনার কথা শুনিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু যদি আমাদিগের বিপদ শুনিতে চান্‌, তবে রাজপথ হইতে দূরে চলুন। রাত্রে কে কোথায় আছে, বলা যায় না।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তবে তোমরা আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া তিনি দলনী ও কুল্‌সম্‌কে সঙ্গে করিয়া নগরাভিমুখে চলিলেন; এক ক্ষুদ্র গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া 'রামচরণ' বলিয়া ডাকিলেন। রামচরণ আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। ব্রহ্মচারী তাহাকে আলো জ্বালিতে আজ্ঞা করিলেন।

ব্রহ্মচারী একটা আসনে উপবেশন করিলেন—স্ত্রীলোকেরা ভূম্যাসনে উপবেশন করিলেন। প্রথমে দলনী আত্মপরিচয় দিলেন। পরে দলনী রাত্রের ঘটনা সকল অকপটে বিবৃত করিলেন।

ব্রহ্মচারী দলনীকে বলিলেন, "আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন না। প্রথমে পত্রের দ্বারা

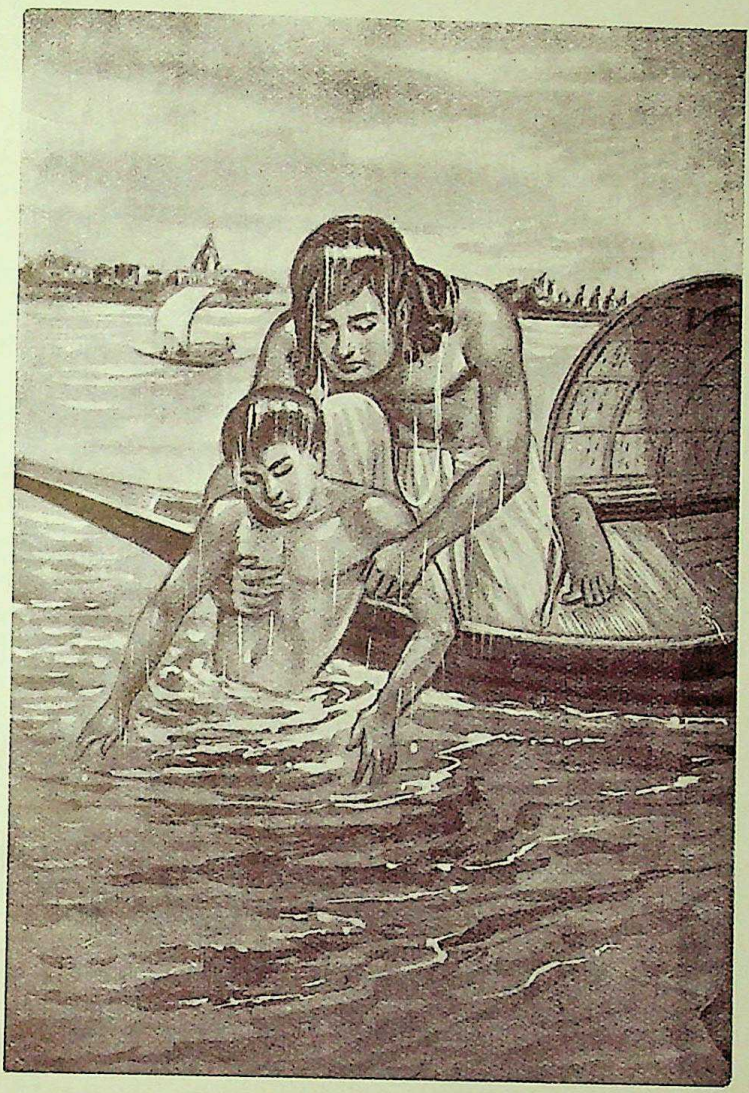

…চন্দ্রশেখর প্রতাপকে ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন… [পৃষ্ঠা—১৩

তাঁহাকে সবিশেষ অবগত করুন। যদি আপনার প্রতি তাঁহার স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন।"

তখন দলনী পত্র লিখিতে লাগিলেন। লিপি সমাপ্ত হইলে দলনী তাহা ব্রহ্মচারীর হস্তে দিলেন।

স্ত্রীলোকদিগের অবস্থিতি-বিষয়ে রামচরণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া ব্রহ্মচারী লিপি লইয়া চলিয়া গেলেন। মুঙ্গেরের যে-সকল রাজ-কর্ম্মচারী হিন্দু, ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগের নিকট বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। মুসলমানেরাও তাঁহাকে চিনিত; সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই তাঁহাকে মানিত।

মুন্সী রামগোবিন্দ রায়, ব্রহ্মচারীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। ব্রহ্মচারী সূর্য্যোদয়ের পর মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রামগোবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দলনীর পত্র তাঁহার হস্তে দিলেন। বলিলেন, "আমার নাম করিও না। এক ব্রাহ্মণ পত্র আনিয়াছে, এই কথা বলিও।"

মুন্সী বলিলেন, "আপনি উত্তরের জন্য কাল আসিবেন।" কাহার পত্র, তাহা মুন্সী কিছুই জানিলেন না।

ব্রহ্মচারী পুনর্ব্বার পূর্ব্ববর্ণিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; দলনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "কল্য উত্তর আসিবে। কোনপ্রকারে অদ্য কালযাপন করুন।"

এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এইস্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রতাপ

সুন্দরী বড় রাগ করিয়াই শৈবলিনীর বজরা হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। ঘরে আসিয়া অনেক কাঁদিয়াছিল। তারপর চন্দ্রশেখর আসিয়া দেশত্যাগী হইয়া গেলেন। তারপর কিছুদিন অমনি-অমনি গেল। শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

সুন্দরী, চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসিনীকন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ শ্বশুরবাড়ী আসিয়া থাকিতেন। সুন্দরীর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল। তাহার নাম—রূপসী। রূপসী শ্বশুর-বাড়ীতেই থাকিত।

সুন্দরী পিতাকে বলিল, "আমি রূপসীকে দেখিতে যাইব, তাহার বিষয়ে আমি বড় কু-স্বপ্ন দেখিয়াছি।"

সুন্দরী রূপসীর শ্বশুরালয়ে গেল।

রূপসীর স্বামী কে? সেই প্রতাপ। শৈবলিনীকে বিবাহ করিলে, প্রতিবাসিপুত্র প্রতাপকে চন্দ্রশেখর সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন। চন্দ্রশেখর প্রতাপের চরিত্রে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। সুন্দরীর ভগিনী রূপসী বয়স্থা হইলে তাহার সঙ্গে প্রতাপের বিবাহ ঘটাইলেন। কেবল তাহাই নহে, চন্দ্রশেখর—কাশেম আলি খাঁর শিক্ষাদাতা। তাঁহার কাছে বিশেষ প্রতিপন্ন। চন্দ্রশেখর, নবাবের সরকারে প্রতাপের চাকরি করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয় গুণে দিন-দিন উন্নতি করিতে লাগিলেন। এক্ষণে প্রতাপ—জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা এবং দেশ-বিখ্যাত নাম। সুন্দরীর শিবিকা তাঁহার পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। রূপসী তাহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া সাদরে গৃহে লইয়া গেল।

পরে প্রতাপ অবকাশমত সুন্দরীকে বেদগ্রামের সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যান্য কথার পর চন্দ্রশেখরের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুন্দরী বলিল, "আমি সেই কথা বলিতে আসিয়াছি, বলি, শুন।"

এই বলিয়া সুন্দরী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বিবৃত করিল। শুনিয়া প্রতাপ বিস্মিত ও স্তব্ধ হইলেন।

কিঞ্চিৎ পরে মাথা তুলিয়া প্রতাপ কিছু রুক্ষভাবে সুন্দরীকে বলিলেন, "এতদিন আমাকে এ-কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন? আমাকে বলিয়া পাঠাইলে কিছু উপকার হইতে পারিত।"

পরদিন প্রতাপ এক পাচক ও এক ভৃত্যমাত্র সঙ্গে লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। ভৃত্যের নাম—রামচরণ। প্রতাপ কোথায় গেলেন, প্রকাশ করিয়া গেলেন না। কেবল রূপসীকে বলিয়া গেলেন, "আমি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান করিতে চলিলাম। সন্ধান না করিয়া ফিরিব না।"

যে-গৃহে ব্রহ্মচারী দলনীকে রাখিয়া গেলেন, মুঙ্গেরে সে-ই প্রতাপের বাসা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গঙ্গাতীরে

কলিকাতার কৌন্সিল স্থির করিয়াছিলেন, নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন। সম্প্রতি আজিমাবাদের কুঠিতে কিছু অস্ত্র পাঠানো আবশ্যক, সেইজন্য এক নৌকা অস্ত্র বোঝাই দিলেন।

আজিমাবাদের অধ্যক্ষ ইলিস সাহেবকে কিছু গুপ্ত উপদেশ প্রেরণ আবশ্যক হইল। আমিয়ট সাহেব নবাবের সঙ্গে গোলযোগ মিটাইবার জন্য মুঙ্গেরে আছেন—সেখানে তিনি কি করিতেছেন, কি বুঝিলেন, তাহা না জানিয়াও ইলিসকে কোনপ্রকার অবধারিত উপদেশ দেওয়া যায় না। অতএব একজন চতুর কর্ম্মচারীকে তথায় পাঠানো আবশ্যক ছিল। সে আমিয়টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার উপদেশ লইয়া ইলিসের নিকট যাইবে এবং কলিকাতার কৌন্সিলের অভিপ্রায় ও আমিয়টের অভিপ্রায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবে।

এইসকল কার্য্যের জন্য গবর্ণর বান্সিটার্ট, ফষ্টরকে পুরন্দরপুর হইতে আনিলেন। সুতরাং ফষ্টরকে কলিকাতায় আসিয়াই পশ্চিম যাত্রা করিতে হইল। তিনি এ-সকল বৃত্তান্তের সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, এজন্য শৈবলিনীকে অগ্রেই মুঙ্গেরে পাঠাইয়াছিলেন। ফষ্টর পথিমধ্যে শৈবলিনীকে ধরিলেন।

ফষ্টর অস্ত্রের নৌকা এবং শৈবলিনীর সহিত মুঙ্গেরে আসিয়া তীরে নৌকা বাঁধিলেন। আমিয়টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইলেন, কিন্তু এমন সময়ে গুর্‌গন্ খাঁ নৌকা আটক করিলেন।

ফষ্টরের দুইখানি নৌকা মুঙ্গেরের ঘাটে বাঁধা। একখানি দেশী ভড়—আর একখানি বজরা। ভড়ের উপর কয়েকজন নবাবের সিপাহী পাহারা দিতেছে। তীরেও কয়েকজন সিপাহী। এইখানিতেই অস্ত্র বোঝাই—এইখানিই গুর্‌গন্ খাঁ আটক করিতে চাহেন।

বজরাখানিতে অস্ত্র বোঝাই নহে। সেখানি ভড় হইতে হাত-পঞ্চাশ দূরে আছে। সেখানে কেহ নবাবের পাহারা নাই। ছাদের

উপর একজন 'তেলিঙ্গা' নামক ইংরেজদিগের সিপাহী বসিয়া নৌকা রক্ষণ করিতেছিল।

তীরে একটা কসাড়-বন ছিল। তাহার অন্তরালে থাকিয়া এক ব্যক্তি কাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। নিরীক্ষণকারী স্বয়ং প্রতাপ রায়।

প্রতাপ রায় দেখিলেন, প্রহরী ঢুলিতেছে। তখন প্রতাপ রায় আসিয়া ধীরে-ধীরে জলে নামিলেন, প্রহরী জলের শব্দ পাইয়া ঢুলিতে-ঢুলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "হুকুমদার?" প্রতাপ রায় উত্তর করিলেন না। প্রহরী ঢুলিতে লাগিল। নৌকার ভিতরে ফষ্টর সতর্ক হইয়া জাগিয়াছিলেন। তিনিও প্রহরীর বাক্য শুনিয়া বজরার মধ্য হইতে ইতস্তত দৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, একজন জলে স্নান করিতে নামিয়াছে।

এমন সময় কসাড়-বন হইতে অকস্মাৎ বন্দুকের শব্দ হইল। বজরার প্রহরী গুলির দ্বারা আহত হইয়া জলে পড়িয়া গেল। প্রতাপ তখন যেখানে নৌকার অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছিল, সেইখানে আসিয়া ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রহিলেন।

বন্দুকের শব্দ হইবামাত্র নৌকার লোকেরা জাগরিত হইল। ফষ্টর বন্দুক হাতে করিয়া বাহির হইলেন।

বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে—কলকল রবে গঙ্গা ধাবিত হইতেছেন। সেই স্রোতে প্রহরীর শব ভাসিয়া যাইতেছে।

কসাড়-বনের উপর ধূম-রেখা দেখিয়া ফষ্টর স্বহস্তস্থিত বন্দুক উত্তোলন করিয়া সেই বনের দিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু

কসাড়-বনের ভিতর অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, আবার বন্দুকের শব্দ হইল—ফষ্টর মস্তকে আহত হইয়া প্রহরীর ন্যায় গঙ্গাস্রোতো-মধ্যে পতিত হইলেন। তাঁহার হস্তস্থিত বন্দুক সশব্দে নৌকার উপরেই পড়িল।

প্রতাপ সেইসময় কটি হইতে ছুরিকা নিষ্কোষিত করিয়া বজরার বন্ধন-রজ্জু সকল কাটিলেন, এক লাফ দিয়া বজরার উপর উঠিলেন।

দ্বিতীয় নৌকার লোকেরা বজরার নিকটে আসিয়া দেখিল, নৌকা বাহির জলে গিয়াছে।

লগি হাতে প্রতাপ ফিরিয়া দেখিলেন, আর-এক সিপাহী নৌকার ছাদের উপর বসিয়া বন্দুক উঠাইতেছে। প্রতাপ লগি ফিরাইয়া সিপাহীর হাতের উপর মারিলেন; তাহার হাত অবশ হইল, বন্দুক পড়িয়া গেল। প্রতাপ সেই বন্দুক তুলিয়া লইলেন। তখন তিনি নৌকাস্থিত সকলকে বলিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়, নবাবও আমাকে ভয় করেন; এই দুই বন্দুক আর লগির বাড়ি—বোধহয় তোমাদের কয়জনকে একলাই মারিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে আর কাহাকে কিছু বলিব না। আমি হালে যাইতেছি, দাঁড়ীরা সকলে দাঁড় ধরুক। আর-সকলে যেখানে যে আছো,—সেখানে থাকো। নড়িলেই মরিবে—নচেৎ শঙ্কা নাই।"

এই বলিয়া প্রতাপ রায় দাঁড়ীদিগকে একটা লগির খোঁচা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড় ধরিল। প্রতাপ রায় গিয়া নৌকার হাল ধরিলেন। কেহ আর কিছু বলিল না। নৌকা দ্রুতবেগে চলিল।

জনকয়েক লোক বন্দুক লইয়া এক ডিঙ্গীতে উঠিয়া বজরা ধরিতে আসিল। তাহারা নিকটে আসিলে, দুই বন্দুকই তাহাদিগের উপর লক্ষ্য করিয়া ছাড়িলেন। দুইজন লোক আহত হইল, অবশিষ্ট লোক ভীত হইয়া ডিঙ্গী ফিরাইয়া পলায়ন করিল।

কসাড়-বনে লুক্কায়িত রামচরণ, প্রতাপকে নিষ্কণ্টক দেখিয়া এবং সিপাহীগণ কসাড়-বন খুঁজিতে আসিতেছে দেখিয়া ধীরে-ধীরে সরিয়া গেল।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বজ্রাঘাত

সেই তরণীমধ্যে নিদ্রা হইতে জাগিলেন—শৈবলিনী।

বজরার মধ্যে দুইটি কামরা—একটিতে ফষ্টর ছিলেন, আর-একটিতে শৈবলিনী এবং তাঁহার দাসী পার্ব্বতী। প্রথম বন্দুকের শব্দে শৈবলিনীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—তাহার পর প্রহরীর জলে পতনের শব্দ শুনিলেন।

যখন আবার বন্দুকের শব্দ হইল এবং বড় গণ্ডগোল হইয়া উঠিল, তখন তাঁহার সম্পূর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইল। শৈবলিনী পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছ?"

পা। কিছু না। লোকের কথায় বোধ হইতেছে, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে।

শৈবলিনী বলিলেন, "একজন ডাকাতকে ডাকিয়া আনো না, একটু জিজ্ঞাসা-পড়া করি।"

পার্ব্বতী রাগ করিয়া বলিল, "ডাকিতে হইবে না, তাহারা আপনারাই আসিবে।"

কিন্তু চারিদণ্ডকাল পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল, ডাকাত কেহ আসিল না।

পার্ব্বতী কাঁপিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে নৌকা আসিয়া এক চরে লাগিল। পরে তথায় কয়েকজন লাঠিয়াল এক শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অগ্রে-অগ্রে রামচরণ।

শিবিকা, বাহকেরা চরের উপর রাখিল। রামচরণ বজরায় উঠিয়া প্রতাপের কাছে গেল। পরে প্রতাপের উপদেশ পাইয়া সে কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। শৈবলিনীকে বলিল, "আপনি নামুন।"

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কোথায় যাইব?"

রামচরণ বলিল, "আমি আপনার চাকর; কোন চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে আসুন। সাহেব মরিয়াছে।"

শৈবলিনী নিঃশব্দে রামচরণের সঙ্গে আসিলেন। তাহার সঙ্গে-সঙ্গে নৌকা হইতে নামিলেন। রামচরণ শৈবলিনীকে শিবিকামধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলে, শৈবলিনী শিবিকারূঢ়া হইলেন; রামচরণ শিবিকা সঙ্গে প্রতাপের গৃহে গেল।

তখন দলনী এবং কুল্‌সম্ সেই গৃহে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইবে বলিয়া, যেখানে তাঁহারা ছিলেন, সেখানে শৈবলিনীকে লইয়া গেল না, উপরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া, রামচরণ আলো জ্বালিয়া রাখিয়া, শৈবলিনীকে প্রণাম করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিদায় হইল।

রামচরণ আপনার বুদ্ধি খরচ করিয়া শৈবলিনীকে প্রতাপের গৃহে আনিয়া তুলিল। প্রতাপের সেরূপ অনুমতি ছিল না। তিনি রামচরণকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "পাল্কী জগৎ শেঠের গৃহে লইয়া যাইও।"

প্রতাপ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া নিজগৃহাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহদ্বারে আসিয়া দ্বার ঠেলিলে, রামচরণ দ্বার মোচন করিল। রামচরণ যে তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিয়াছে, তাহা গৃহে আসিয়াই রামচরণের নিকট শুনিলেন। শুনিয়া কিছু বিরক্ত হইলেন।

রামচরণ বিশ্রাম করিতে গেল। প্রতাপ একাকী নিঃশব্দে আপন শয়ন-কক্ষাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দ্বার মুক্ত করিলেন, দেখিলেন—পালঙ্কে শয়ানা শৈবলিনী। রামচরণ বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিল যে, প্রতাপের শয্যাগৃহেই সে শৈবলিনীকে রাখিয়া আসিয়াছিল।

প্রতাপ বন্দুকটি দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিলেন। বন্দুকটি রাখিতে পড়িয়া গেল। সেই শব্দে শৈবলিনী চক্ষু চাহিলেন—প্রতাপকে দেখিতে পাইলেন। শৈবলিনী চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। তখন শৈবলিনী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "একি এ? কে তুমি?"

এই বলিয়া শৈবলিনী পালঙ্কে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। প্রতাপ জল আনিয়া শৈবলিনীর মুখমণ্ডলে সিঞ্চন করিলেন। অচিরাৎ শৈবলিনী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন!

শৈবলিনী স্থিরভাবে বলিলেন, "কে তুমি? প্রতাপ? না, কোন দেবতা ছলনা করিতে আসিয়াছ!"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ।"

শৈ। একবার নৌকায় বোধ হইয়াছিল, যেন তোমার কণ্ঠ কানে প্রবেশ করিল। কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে, সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখিতে-দেখিতে জাগিয়াছিলাম, সেই কারণ ভ্রান্তি মনে করিলাম!

এই বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শৈবলিনী নীরব হইয়া রহিলেন। শৈবলিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থিরা হইয়াছেন দেখিয়া প্রতাপ বিনা বাক্যব্যয়ে গমনোদ্যত হইলেন। শৈবলিনী বলিলেন, "যাইও না।"

প্রতাপ অনিচ্ছাপূর্ব্বক দাঁড়াইলেন।

শৈবলিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমার এই বাসা।"

শৈবলিনী। আমাকে এখানে কে আনিল?

প্র। আমরাই আনিয়াছি।

শৈ। আমরা কে?

প্র। আমি আর আমার চাকর।

শৈ। কেন তোমরা এখানে আনিলে?

প্রতাপ অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "তোমাকে উদ্ধার করিলাম,—আবার তুমি জিজ্ঞাসা করো, এখানে কেন আনিলে?"

সেই সময়ে বহির্দ্বারে একটা গোল উপস্থিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্

রামচরণ নৌকা হইতে শৈবলিনীকে লইয়া উঠিয়া গেলে এবং প্রতাপ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, যে তেলিঙ্গা-সিপাহী প্রতাপের

আঘাতে অবসন্নহস্ত হইয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল, সে ধীরে-ধীরে তটের উপর উঠিল। উঠিয়া যে-পথে শৈবলিনীর শিবিকা গিয়াছে সেই পথে চলিল। অতি দূরে থাকিয়া শিবিকা লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সে জাতিতে মুসলমান। তাহার নাম, বকাউল্লা খাঁ।

বকাউল্লা শিবিকার সঙ্গে-সঙ্গে অলক্ষ্যে থাকিয়া প্রতাপের বাসা পর্য্যন্ত আসিল। দেখিল যে, শৈবলিনী প্রতাপের গৃহে প্রবেশ করিল। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের কুঠিতে গেল।

বকাউল্লা তথায় আসিয়া দেখিল, বজরার বৃত্তান্ত আমিয়ট সকল শুনিয়াছেন। শুনিল, আমিয়ট সাহেব বলিয়াছেন যে, যে অদ্য রাত্রেই অত্যাচারীদিগের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমিয়ট সাহেব তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন। বকাউল্লা তখন আমিয়ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাঁহাকে সবিশেষ বৃত্তান্ত বলিল—বলিল যে, "আমি সেই দস্যুর গৃহ দেখাইয়া দিতে পারি।"

আমিয়ট সাহেবের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিন-চারিজন সিপাহী এবং একজন নায়েককে বকাউল্লার সঙ্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। বলিলেন, "দুরাত্মাদিগকে ধরিয়া আমার নিকটে লইয়া আইস।"

বকাউল্লা বলিল, "তবে দুইজন ইংরেজ সঙ্গে দিউন। প্রতাপ রায় সাক্ষাৎ শয়তান—এদেশীয় লোক তাহাকে ধরিতে পারিবে না।"

গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ নামক দুইজন ইংরেজ আমিয়টের আজ্ঞামত বকাউল্লার সঙ্গে সশস্ত্রে চলিলেন। গমনকালে গল্‌ষ্টন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সেই বাড়ীর মধ্যে কখন গিয়াছিলে?"

বকাউল্লা বলিল, "না।"

গল্‌ষ্টন্ জন্‌সন্‌কে বলিলেন, "তবে বাতি ও দেশলাই লও। হিন্দু তেল পোড়ায় না—খরচ হইবে।"

জন্‌সন্ পকেটে বাতি ও দীপশলাকা গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা তখন ইংরেজদিগের রণযাত্রার গভীর পদনিক্ষেপে রাজপথ বহিয়া চলিলেন। কেহ কথা কহিল না। পশ্চাৎ-পশ্চাৎ চারিজন সিপাহী, নায়েক ও বকাউল্লা চলিল।

নগরপ্রহরিগণ পথে তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভীত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্, সিপাহী লইয়া প্রতাপের বাসার সম্মুখে নিঃশব্দে আসিয়া ধীরে-ধীরে করাঘাত করিলেন। রামচরণ উঠিয়া দ্বার খুলিতে আসিল।

রামচরণ অদ্বিতীয় ভৃত্য। পা টিপিতে, গা টিপিতে, তৈল মাখাইতে সুশিক্ষিতহস্ত। কিন্তু এ-সকল সামান্য গুণ। রামচরণ লাঠিবাজিতে মুরশিদাবাদ-প্রদেশে প্রসিদ্ধ। বন্দুকে রামচরণ কেমন অভ্রান্তলক্ষ্য এবং ক্ষিপ্রহস্ত, তাহার পরিচয় ফল্টরের শোণিতে গঙ্গাজলে লিখিত হইয়াছিল।

কিন্তু এ-সকল অপেক্ষা রামচরণের আর একটি গুণ ছিল—ধূর্ত্ততা। রামচরণ শৃগালের মত ধূর্ত্ত। অথচ অদ্বিতীয় প্রভুভক্ত এবং বিশ্বাসী।

রামচরণ দ্বার খুলিতে আসিয়া ভাবিল, 'এখন দুয়ারে ঘা দেয় কে? একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছি, রাত্রিকালে না দেখিয়া দুয়ার খোলা হইবে না!'

এই ভাবিয়া রামচরণ নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শব্দ শুনিতে লাগিল। শুনিল, দুইজনে অস্ফুটস্বরে একটা বিকৃতভাষায় কথা কহিতেছে—রামচরণ তাহাকে ইঙ্গিল-মিঙ্গিল বলিত—এখনকার

লোক বলে, ইংরেজি। রামচরণ মনে মনে বলিল, "রসো বাবা। দুয়ার খুলি ত' বন্দুক হাতে করিয়া—ইণ্ডিল-মিণ্ডিলকে যে বিশ্বাস করে, সে শ্যালা!"

রামচরণ আরও ভাবিল, 'বুঝি একটা বন্দুকের কাজ নয়, কর্ত্তাকেও ডাকি।' এই ভাবিয়া রামচরণ প্রতাপকে ডাকিবার অভিপ্রায়ে দ্বার হইতে ফিরিল।

এইসময়ে ইংরেজদিগেরও ধৈর্য্য ফুরাইল। জন্‌সন্ বলিলেন, "অপেক্ষা কেন, লাথি মারো। ভারতবর্ষীয়-কবাট ইংরেজি-লাথিতে টিকিবে না।"

গল্‌ষ্টন্ লাথি মারিলেন। দ্বার খড়-খড়, ছড়-ছড়, ঝনঝন করিয়া উঠিল। রামচরণ দৌড়িল। শব্দ—প্রতাপের কানে গেল। প্রতাপ উপর হইতে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। সেবার কবাট ভাঙ্গিল না।

পরে জন্‌সন্ লাথি মারিলেন। কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।

"এইরূপে ব্রিটিশ-পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক" বলিয়া ইংরেজরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সিপাহীগণ প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে রামচরণের সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। রামচরণ চুপি-চুপি প্রতাপকে বলিল, "অন্ধকারে লুকাও, ইংরেজ আসিয়াছে, বোধহয় আমবাতের কুঠি থেকে।" রামচরণ, আমিয়টের পরিবর্ত্তে আমবাত বলিত।

প্র। ভয় কি?

রা। আটজন লোক।

প্র। আপনি লুকাইয়া থাকিব—আর এ-বাড়ীতে যে কয়জন স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের দশা কি হইবে? তুমি আমার বন্দুক লইয়া আইস।

রামচরণ যদি ইংরেজদের বিশেষ পরিচয় জানিত, তবে প্রতাপকে কখনই লুকাইতে বলিত না। তাহারা যতক্ষণ কথোপকথন করিতেছিল, ততক্ষণে সহসা গৃহ আলোকে পূর্ণ হইল। জন্‌সন্ জ্বালিত বর্ত্তিকা একজন সিপাহীর হস্তে দিলেন। বর্ত্তিকার আলোকে ইংরেজরা দেখিল, সিঁড়ির উপর দুইজন লোক দাঁড়াইয়া আছে। জন্‌সন্ বকাউল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এই?"

বকাউল্লা ঠিক চিনিতে পারিল না। অন্ধকার রাত্রে সে প্রতাপ ও রামচরণকে দেখিয়াছিল। সুতরাং ভাল চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার ভগ্ন-হস্তের যাতনা অসহ্য হইয়াছিল—যে-কেহ তাহার দায়ে দায়ী। বকাউল্লা বলিল, "হাঁ, ইহারাই বটে।"

তখন ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়া ইংরেজরা সিঁড়ির উপর উঠিল। সিপাহীরা পশ্চাৎ-পশ্চাৎ আসিল দেখিয়া, রামচরণ ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রতাপের বন্দুক আনিতে উপরে উঠিতে লাগিল।

জন্‌সন্ তাহা দেখিলেন, নিজ হস্তের পিস্তল উঠাইয়া রামচরণকে লক্ষ্য করিলেন। রামচরণ চরণে আহত হইল, চলিবার শক্তিরহিত হইয়া বসিয়া পড়িল।

প্রতাপ নিরস্ত্র, পলায়নে অনিচ্ছুক এবং পলায়নে রামচরণের যে দশা ঘটিল, তাহাও দেখিলেন। প্রতাপ ইংরেজদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে? কেন আসিয়াছ?"

গল্‌ষ্টন্ প্রতাপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

প্রতাপ বলিলেন, "আমি প্রতাপ রায়।"

সে-নাম বকাউল্লার মনে ছিল। বজরার উপর বন্দুক-হাতে প্রতাপ গর্ব্বভরে বলিয়াছিলেন, "শুন, আমার নাম প্রতাপ রায়।" বকাউল্লা বলিল, "জনাব, এই ব্যক্তি সরদার।"

জন্‌সন্ প্রতাপের এক হাত ধরিলেন, গল্‌ষ্টন্ আর-এক হাত ধরিলেন। প্রতাপ দেখিলেন, বলপ্রকাশ অনর্থক। নিঃশব্দে সকল সহ্য করিলেন। নায়েকের হাতে হাতকড়ি ছিল, প্রতাপের হাতে লাগাইয়া দিল। গল্‌ষ্টন্ পতিত রামচরণকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওটা?"

জন্‌সন্ দুইজন সিপাহীকে আজ্ঞা দিলেন যে, "উহাকেও লইয়া আইস।" দুইজন সিপাহী রামচরণকে টানিয়া লইয়া চলিল।

এইসকল গোলযোগ শুনিয়া দলনী ও কুল্‌সম্ জাগরিত হইয়া মহা ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা কক্ষদ্বার ঈষন্মাত্র মুক্ত করিয়া এইসকল দেখিতেছিলেন। সিঁড়ির পাশে তাঁহাদের শয়নগৃহ।

যখন ইংরেজরা প্রতাপ ও রামচরণকে লইয়া নামিতেছিলেন, তখন সিপাহীর করস্থ দীপের আলোক অকস্মাৎ দ্বারপথে দলনীর চক্ষুর উপর পড়িল। বকাউল্লা সে-চক্ষু দেখিতে পাইল। দেখিয়াই বলিল, "ফষ্টর সাহেবের বিবি।"

গল্‌ষ্টন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যও ত'। কোথায়?"

বকাউল্লা পূর্ব্বকথিত দ্বার দেখাইয়া কহিল, "ঐ ঘরে।"

জন্‌সন্ ও গল্‌ষ্টন্ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দলনী এবং কুল্‌সম্‌কে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আইস।"

দলনী ও কুল্‌সম্ মহাভীত হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে-সঙ্গে চলিলেন।

সেই গৃহমধ্যে শৈবলিনীই একা রহিলেন। শৈবলিনীও সকল দেখিয়াছিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাপের বিচিত্র গতি

সকলে চলিয়া গেলে, গৃহমধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া শৈবলিনী চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভাবিলেন, "এখন কি করি? একা, তাহাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমার ভয় নাই, মৃত্যুর অপেক্ষা বিপদ্ নাই। যে স্বয়ং মৃত্যুর কামনা করে, তাহার কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয় না? আত্মহত্যা বড় সহজ। সহজই-বা কিসে? কৈ, একদিনও ত' মরিতে পারিলাম না।

আশা থাকিতে মানুষ মরিতে পারে না। কিন্তু, আজ? আজ মরিবার দিন বটে। তবে, প্রতাপকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে—প্রতাপের কি হয়, তাহা না জানিয়া মরিতে পারিব না।"

শৈবলিনী আপনার কপালে করাঘাত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। বেদগ্রামের সেই গৃহ মনে পড়িল।

শৈবলিনী আবার কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মরিব? না, আজ নহে। মরি ত' সেই বেদগ্রামে গিয়া মরিব।"

শৈবলিনী শয়ন করিলেন। প্রভাতকালে তাঁহার নিদ্রা আসিল—নিদ্রায় নানাবিধ কুস্বপ্ন দেখিলেন। যখন তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে—শৈবলিনী চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলেন—চন্দ্রশেখর!

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুণ্যের স্পর্শ—রমানন্দ স্বামী

মুঙ্গেরের এক মঠে একজন পরমহংস বসতি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম—রমানন্দ স্বামী। সেই ব্রহ্মচারী তাঁহার সঙ্গে বিনীত-ভাবে কথোপকথন করিতেছিলেন। অনেকে জানিতেন, রমানন্দ স্বামী—সিদ্ধপুরুষ। তিনি অদ্বিতীয় জ্ঞানী বটে। প্রবাদ ছিল যে, ভারতবর্ষের লুপ্ত দর্শন-বিজ্ঞান সকলই তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, "শুন বৎস চন্দ্রশেখর! যে-সকল বিদ্যা উপার্জ্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর, কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেননা, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ-দুঃখ, বিজ্ঞের কাছে একই।"

এই বলিয়া রমানন্দ স্বামী প্রথমে যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, দশরথ প্রভৃতি প্রাচীন রাজগণের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, নল রাজা প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন। দেখাইলেন, মহাপুণ্যাত্মা রাজগণ চিরদুঃখী—কদাচিৎ সুখী। পরে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিলেন—দেখাইলেন, তাঁহারাও দুঃখী। ইন্দ্রাদি দেবতার উল্লেখ করিলেন,—দেখাইলেন, সুরলোকও দুঃখপূর্ণ।

রমানন্দ স্বামী বলিতে লাগিলেন, "আর যদি দুঃখের অস্তিত্বই স্বীকার করো, তবে এই সর্ব্বব্যাপী দুঃখ নিবারণের উপায় কি নাই? উপায় নাই। তবে যদি সকলে সকলের দুঃখ নিবারণের জন্য নিযুক্ত থাকে, তবে অবশ্য নিবারণ করিতে পারে। দেখ, বিধাতা স্বয়ং

অহরহঃ সৃষ্টির দুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত। সংসারের সেই দুঃখনিবৃত্তিতে ঐশিক-দুঃখেরও নিবারণ হয়। দেবগণ জীবদুঃখ-নিবারণে নিযুক্ত—তাহাতেই দৈব-সুখ। নচেৎ ইন্দ্রিয়াদিবিকারশূন্য দেবতার অন্য সুখ নাই।" পরে ঋষিগণের লোকহিতৈষিতা—ভীষ্মাদি দেবগণের পরোপকারিতার বর্ণন করিলেন। দেখাইলেন, যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে।

তাঁহার সুকণ্ঠ-নির্গত সেই অপূর্ব্ব বাক্যসকল চন্দ্রশেখরের কর্ণে তূর্য্যনাদবৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল—কখনও মেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর শব্দে শব্দিত হইতে লাগিল—কখনও বীণানিক্কণবৎ মধুর বোধ হইতে লাগিল।

ব্রহ্মচারী বিস্মিত, মোহিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "গুরুদেব! আজি হইতে আমি আপনার নিকট এ-মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।"

রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে আলিঙ্গন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন পরিচয়

এদিকে যথাসময়ে ব্রহ্মচারিদত্ত পত্র নবাবের নিকট পেষ হইল। নবাব জানিলেন, সেখানে দলনী আছেন। তাঁহাকে ও কুল্‌সম্‌কে লইয়া যাইবার জন্য প্রতাপ রায়ের বাসায় শিবিকা প্রেরিত হইল।

তখন বেলা হইয়াছে। তখন সে-গৃহে শৈবলিনী ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া নবাবের অনুচরেরা বেগম বলিয়া স্থির করিল।

শৈবলিনী শুনিলেন, তাঁহাকে কেল্লায় যাইতে হইবে। অকস্মাৎ তাঁহার মনে এক দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী আপত্তি না করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন।

খোজা শৈবলিনীকে দুর্গে আনিয়া অন্তঃপুরে নবাবের নিকটে লইয়া গেল। নবাব দেখিলেন, এ ত' দলনী নহে! আরও দেখিলেন, দলনীও এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী নহে।

নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

শৈ। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

ন। তুমি আসিলে কেন?

শৈ। রাজভৃত্যগণ আমাকে লইয়া আসিল।

ন। তোমাকে বেগম বলিয়া আনিয়াছে। বেগম আসিলেন না কেন?

শৈ। তিনি সেখানে নাই।

ন। তিনি তবে কোথায়?

যখন গল্‌ষ্টন্ ও জন্‌সন্ দলনী ও কুল্‌সম্‌কে প্রতাপের বাসা হইতে লইয়া যায়, শৈবলিনী তাহা দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা কে, তাহা জানিতেন না। মনে করিয়াছিলেন, চাকরাণী বা নর্ত্তকী। কিন্তু নবাবের ভৃত্য তাঁহাকে বলিল যে, নবাবের বেগম প্রতাপের গৃহে ছিল এবং তাঁহাকে সেই বেগম মনে করিয়া নবাব লইতে পাঠাইয়াছেন, তখনই শৈবলিনী বুঝিয়াছিলেন যে, বেগমকে ইংরেজরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব, শৈবলিনীকে নিরুত্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ ?"

শৈ। দেখিয়াছি।

ন। কোথায় দেখিলে ?

শৈ। যেখানে আমরা কাল রাত্রে ছিলাম।

ন। সে কোথায় ? প্রতাপ রায়ের বাসায় ?

শৈ। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

ন। বেগম সেখান হইতে কোথায় গিয়াছেন জানো ?

শৈ। দুইজন ইংরেজ তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। কি বলিলে ?

শৈবলিনী পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর পুনরুক্ত করিল। নবাব মৌনী হইয়া রহিলেন। গুরগন্ খাঁকে ডাকিতে আদেশ করিলেন। শৈবলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইংরেজ কেন বেগমকে ধরিয়া লইয়া গেল, জানো ?"

শৈ। না।

ন। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল ?

শৈ। তাঁহাকেও উহারা সেইসঙ্গে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

ন। তাহার বাসায় আর কোন লোক ছিল ?

শৈ। একজন চাকর ছিল, তাহাকেও ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

নবাব আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, জানো ?"

শৈবলিনী এতক্ষণ সত্য বলিতেছিলেন, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "না।"

ন। প্রতাপ কে? তাহার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিলেন।

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল?

শৈ। সরকারের চাকরি করিবেন বলিয়া।

ন। তোমার কে হয়?

শৈ। আমার স্বামী।

ন। তোমার নাম কি?

শৈ। রূপসী।

অনায়াসে শৈবলিনী এই উত্তর দিলেন। পাপিষ্ঠা এই কথা বলিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

নবাব বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।"

শৈবলিনী বলিলেন, "আমার গৃহ কোথায়—কোথায় যাইব?"

নবাব নিস্তব্ধ হইলেন, পরক্ষণে বলিলেন, "তবে তুমি কোথায় যাইবে?"

শৈ। আমার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দিন। আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ করিতেছি;—আমার স্বামীকে ইংরেজ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; হয় আমার স্বামীকে মুক্ত করিয়া দিন, নচেৎ আমাকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা করিয়া ইহার উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মরিব, সেইজন্য আসিয়াছি!

সংবাদ আসিল, গুর্‌গন্ খাঁ হাজির। নবাব শৈবলিনীকে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এইখানে অপেক্ষা করো, আমি আসিতেছি।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নূতন পথ

নবাব গুর্‌গন্ খাঁকে কহিলেন, "ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। আমার বিবেচনায়, বিবাদের পূর্ব্বে আমিয়টকে অবরুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কেন না, আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বলো?"

গুর্‌গন্ খাঁ কহিলেন, "যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করিলে, বিশ্বাসঘাতক বলিয়া আমাদের নিন্দা হইবে, আর—"

নবাব। আমিয়ট কাল রাত্রে এই সহরমধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। যে আমার অধিকারে থাকিয়া অপরাধ করে, সে দূত হইলেও আমি কেন তাহার দণ্ডবিধান না করিব?

গুর্। যদি সে এরূপ করিয়া থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু, তাহাকে কি প্রকারে ধৃত করিব?

নবাব। এখনই তাহার বাসস্থানে সিপাহী ও কামান পাঠাইয়া দাও। তাহাকে সদলে ধরিয়া লইয়া আসুক।

গুর্। তাহারা এ সহরে নাই। অদ্য দুই প্রহরে চলিয়া গিয়াছে।

নবাব। সে কি! বিনা এত্তেলায়?

গুর্। এত্তেলা দিবার জন্য 'হে' নামক একজনকে রাখিয়া গিয়াছে।

নবাব। এরূপ হঠাৎ বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি? ইহাতে আমার সহিত অসৌজন্য হইল, তাহা জানিয়াই করিয়াছে।

গুর্। তাহাদের হাতিয়ারের নৌকার চড়নদার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করিয়াছে। আমিয়ট বলে, আমাদের লোকে খুন করিয়াছে। সেইজন্য রাগ করিয়া গিয়াছে। বলে, এখানে থাকিলে জীবন অনিশ্চিত।

নবাব। কে খুন করিয়াছে, শুনিয়াছ?

গুর্। প্রতাপ রায় নামক এক ব্যক্তি।

নবাব। আচ্ছা করিয়াছে। তাহার দেখা পাইলে, খেলোয়াৎ দিব। প্রতাপ রায় কোথায়?

গুর্। তাহাদিগের সকলকে বাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়াছে, কি আজিমাবাদে পাঠাইয়াছে, ঠিক শুনি নাই।

নবাব গুর্গন্ খাঁকে বিদায় দিলেন। গুর্গন্ খাঁ যখন যান, নবাব তাঁহার প্রতি বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ এই —"যতদিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয়, ততদিন তোমায় কিছু বলিব না— তারপর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করিব।"

নবাব তাহার পর মীর মুন্সীকে ডাকিয়া আদেশ প্রচার করিলেন, "মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর নামে পরোয়ানা পাঠাও যে, যখন আমিয়টের নৌকা মুরশিদাবাদে উপনীত হইবে, তখন তাহাকে ধরিয়া আবদ্ধ করে এবং তাহার সঙ্গের বন্দীগণকে মুক্ত করিয়া হুজুরে প্রেরণ করে। স্পষ্ট যুদ্ধ না করিয়া, কলে-কৌশলে ধরিতে হইবে, ইহাও লিখিয়া দাও।"

নবাব অন্তঃপুরে প্রত্যাগমন করিয়া, আবার শৈবলিনীকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "এক্ষণে তোমার স্বামীকে মুক্ত করা হইল না।

ইংরেজরা তাহাদিগকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছে। মুরশিদাবাদে হুকুম পাঠাইলাম, সেখানে তাহাদিগকে ধরিবে। তুমি এখন—"

শৈবলিনী হাত জোড় করিয়া কহিলেন, "বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন—এখন লোক পাঠাইলে, ধরা যায় না কি?"

নবাব। ইংরেজদিগকে ধরা অল্প লোকের কর্ম্ম নহে। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাইতে হইলে, বড় নৌকা চাই। ধরিতে-ধরিতে তাহারা মুরশিদাবাদে পৌঁছিবে। বিশেষ, যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া কি জানি, যদি ইংরেজরা আগে বন্দীদিগকে মারিয়া ফেলে; মুরশিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারী সকল আছে, তাহারা কলে-কৌশলে ধরিবে।

নবাবের সহজ কথাবার্ত্তায় শৈবলিনী সাহস পাইয়া আবার হাত-জোড় করিলেন। বলিলেন, "যদি এ অনাথাকে এত দয়া করিয়াছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা—মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ—তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ। তাঁহার হাতে অস্ত্র থাকিলে, তাঁহাকে ইংরেজ কয়েদ করিতে পারিত না; তিনি যদি এখন হাতিয়ার পান, তবে তাঁহাকে কেহ কয়েদ রাখিতে পারিবে না; যদি কেহ তাঁহাকে অস্ত্র দিয়া আসিতে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হইতে পারিবেন, সঙ্গীদিগকেও মুক্ত করিতে পারিবেন।"

নবাব হাসিলেন; বলিলেন, "তুমি বালিকা, ইংরেজ কি, তাহা জানো না। কে তাঁহাকে সে ইংরেজের নৌকায় উঠিয়া অস্ত্র দিয়া আসিবে?"

শৈবলিনী মুখ নত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি হুকুম হয়, যদি নৌকা পাই, তবে আমিই যাইব।"

নবাব উচ্চহাস্য করিলেন। হাসি শুনিয়া শৈবলিনী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। বলিলেন, "প্রভু! না পারি, আমি মরিব—তাহাতে কারও

ক্ষতি নাই, কিন্তু যদি পারি, তবে আমারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধি হইবে।"

নবাব শৈবলিনীর কুঞ্চিত-ভ্রূশোভিত মুখমণ্ডল দেখিয়া বুঝিলেন, এ সামান্য স্ত্রীলোক নহে। ভাবিলেন, মরে মরুক, আমার ক্ষতি কি? যদি পারে ভালই, নহিলে মুরশিদাবাদে মহম্মদ তকি কার্য্যসিদ্ধ করিবে।

শৈবলিনীকে বলিলেন, "তুমি কি একাই যাইবে?"

শৈ। স্ত্রীলোক একা যাইতে পারিব না। যদি দয়া করেন, তবে সঙ্গে একজন দাসী আর একজন রক্ষক আজ্ঞা করিয়া দিন।

নবাব চিন্তা করিয়া মসীবুদ্দীন নামে একজন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ এবং সাহসী খোজাকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া প্রণত হইল। নবাব তাহাকে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে লও এবং একজন হিন্দু-বাঁদী সঙ্গে লও। ইনি যে হাতিয়ার লইতে বলেন, তাহাও লও। নৌকার দারোগার নিকট হইতে একখানি দ্রুতগামী ছিপ লও। এই সকল লইয়া এইক্ষণেই মুরশিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা কর।"

মসীবুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে?"

নবাব। ইনি যাহা বলিবেন, তাহাই করিবে। বেগমদিগের মত ইঁহাকে মান্য করিবে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে লইয়া আসিবে।

পরে উভয়ে নবাবকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল। খোজা যেরূপ করিল, শৈবলিনী দেখিয়া-দেখিয়া সেইরূপ মাটি ছুঁইয়া পিছু হটিয়া সেলাম করিলেন। নবাব হাসিলেন।

নবাব গমনকালে বলিলেন, "বিবি, স্মরণ রাখিও, কখনও যদি মুস্কিলে পড়ো, তবে মীর কাসেমের কাছে আসিও।"

শৈবলিনী পুনর্ব্বার সেলাম করিলেন।

মসীবুদ্দীন, পরিচারিকা ও নৌকা সংগ্রহ করিল এবং শৈবলিনীর কথামত বন্দুক, গুলি, বারুদ, পিস্তল, তরবারী ও ছুরি সংগ্রহ করিল।

সেই রাত্রে তাহারা নৌকারোহণ করিয়া যাত্রা করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাঁদে

জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে! গঙ্গার দুই পার্শ্বে বহুদূর বিস্তৃত বালুকাময় চর। চন্দ্রকরে সিকতা-শ্রেণী অধিকতর ধবল শ্রী ধরিয়াছে। গঙ্গার জল, চন্দ্রকরে প্রগাঢ়তর নীলিমা প্রাপ্ত হইয়াছে। গঙ্গার জল ঘন নীল—তটারূঢ় বনরাজি ঘন শ্যাম, উপরে আকাশ রত্নখচিত নীল। এরূপ সময়ে বিস্তৃতিজ্ঞানে কখনও-কখনও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। নদী অনন্ত, যতদূর দেখিতেছি, নদীর অন্ত দেখিতেছি না, মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্টদৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে। নীচে নদী অনন্ত; পার্শ্বে বালুকা-ভূমি অনন্ত; তীরে বৃক্ষশ্রেণী অনন্ত; উপরে আকাশ অনন্ত। তন্মধ্যে তারকামালা অনন্তসংখ্যক। এমন সময়ে কোন্ মনুষ্য আপনাকে গণনা করে? এই যে নদীর উপকূলে বালুকাভূমে তরণী-শ্রেণী বাঁধা রহিয়াছে, তাহার বালুকাকণার অপেক্ষা মনুষ্যের গৌরব কি?

এই তরণী-শ্রেণীর মধ্যে একখানি বড় বজরা আছে—তাহার উপরে সিপাহীর পাহারা। সিপাহীদ্বয় গঠিত মূর্ত্তির ন্যায় বন্দুক স্কন্ধে করিয়া স্থির দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভিতরে কয়েকজন সাহেব। দুইজনে সতরঞ্চ খেলিতেছেন।

অকস্মাৎ সকলে চমকিয়া উঠিলেন। সেই নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া সহসা বিকট ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। আমিয়ট সাহেব জন্‌সন্‌কে কিস্তি দিতে-দিতে বলিলেন, "ও কি ও?"

জন্‌সন্ বলিলেন, "কার কিস্তি মাত হইয়াছে।"

ক্রন্দন বিকটতর হইল। ধ্বনি বিকট নহে, কিন্তু সেই জলাভূমির নীরব প্রান্তরমধ্যে এই নিশীথ-ক্রন্দন বিকট শুনাইতে লাগিল।

আমিয়ট খেলা ফেলিয়া উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া চারিদিক্ দেখিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন, নিকটে কোথাও শ্মশান নাই। সৈকতভূমির মধ্যভাগ হইতে শব্দ আসিতেছে।

আমিয়ট নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, ধ্বনির অনুসরণ করিয়া চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, সেই বালুকাপ্রান্তর-মধ্যে একাকী কেহ বসিয়া আছে।

আমিয়ট নিকটে গেলেন। দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে।

আমিয়ট হিন্দী ভাল জানিতেন না। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি? কেন কাঁদিতেছ?"

স্ত্রীলোকটি তাঁহার হিন্দী কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমিয়ট পুনঃপুনঃ তাহার কথার কোন উত্তর না পাইয়া হস্তেঙ্গিতের দ্বারা তাহাকে আসিতে বলিলেন। রমণী উঠিল। আমিয়ট অগ্রসর হইলেন। রমণী তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিল। এ আর কেহ নহে—শৈবলিনী।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হাসে

বজরার ভিতরে আসিয়া আমিয়ট গল্‌ফ্টন্‌কে বলিলেন, "এই স্ত্রীলোক একাকিনী চরে বসিয়া কাঁদিতেছিল। ও আমার কথা বুঝে না, আমি উহার কথা বুঝি না! তুমি উহাকে জিজ্ঞাসা কর।"

গল্‌ফ্টন্‌ও প্রায় আমিয়টের মত পণ্ডিত; কিন্তু ইংরেজ-মহলে হিন্দীতে তাঁহার বড় পসার। গল্‌ফ্টন্‌ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

শৈবলিনী কথা কহিলেন না—কাঁদিতে লাগিলেন।

গ। কেন কাঁদিতেছ?

শৈবলিনী তথাপি কথা কহিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

গ। তোমার বাড়ী কোথায়?

শৈবলিনী পূর্ব্ববৎ।

গ। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

শৈবলিনী তদ্রূপ।

গল্‌ফ্টন্‌ হার মানিলেন। কোন কথার উত্তর দিল না দেখিয়া ইংরেজরা শৈবলিনীকে বিদায় দিলেন। শৈবলিনী সে-কথাও বুঝিলেন না—নড়িলেন না—দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আমিয়ট বলিলেন, "এ আমাদিগের কথা বুঝে না—আমরা উহার কথা বুঝি না। পোষাক দেখিয়া বোধ হইতেছে, ও বাঙালীর মেয়ে। একজন বাঙালীকে ডাকিয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বল।"

সাহেবের খানসামারা প্রায় সকলেই বাঙালী-মুসলমান। আমিয়ট তাহাদিগের একজনকে ডাকিয়া কথা কহিতে বলিলেন।

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদিতেছ কেন?"

শৈবলিনী পাগলের হাসি হাসিলেন! খানসামা সাহেবদিগকে বলিল, "পাগল।"

সাহেবরা বলিলেন, "উহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি চায়?"

খানসামা জিজ্ঞাসা করিল। শৈবলিনী বলিলেন, "ক্ষিদে পেয়েছে।"

খানসামা সাহেবদিগকে বুঝাইয়া দিল। আমিয়ট বলিলেন, "উহাকে কিছু খাইতে দাও।"

খানসামা অতি হৃষ্টচিত্তে শৈবলিনীকে বাবুর্চ্চিখানার নৌকায় লইয়া গেল। শৈবলিনী কিছুই খাইলেন না। খানসামা বলিল, "খাও না।"

শৈবলিনী বলিলেন, "ব্রাহ্মণের মেয়ে; তোমাদের ছোঁয়া খাব কেন?"

খানসামা গিয়া সাহেবদিগকে এ-কথা বলিল। আমিয়ট সাহেব বলিলেন, "কোন নৌকায় কোন ব্রাহ্মণ নাই?"

খানসামা বলিল, "একজন সিপাহী ব্রাহ্মণ আছে। আর কয়েদী একজন ব্রাহ্মণ আছে।"

সাহেব বলিলেন, "যদি কাহারও ভাত থাকে, দিতে বল।"

খানসামা শৈবলিনীকে লইয়া প্রথমে সিপাহীদের কাছে গেল। সিপাহীদের নিকট কিছুই ছিল না। তখন খানসামা যে-নৌকায় সেই ব্রাহ্মণ-কয়েদী ছিল, শৈবলিনীকে সেই নৌকায় লইয়া গেল।

ব্রাহ্মণ-কয়েদী—প্রতাপ রায়। একখানি ক্ষুদ্র পান্‌সীতে একা প্রতাপ। বাহিরে, আগে-পিছে শান্ত্রীর পাহারা। নৌকার মধ্যে অন্ধকার।

খানসামা বলিল, "ও গো ঠাকুর!"

প্রতাপ বলিলেন, "কেন?"

খা। তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে?

প্র। কেন?

খা। একটি ব্রাহ্মণের মেয়ে উপবাসী আছে, দুটি দিতে পার?

প্রতাপেরও ভাত ছিল না। কিন্তু প্রতাপ তাহা স্বীকার করিলেন না, বলিলেন, "পারি। আমার হাতের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলো।"

খানসামা শাস্ত্রীকে প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিতে বলিল। শাস্ত্রী বলিল, "হুকুম দেওয়াও।"

খানসামা হুকুম করাইতে গেল।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র।

আমিয়ট জমাদার দ্বারা প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিবার এবং শৈবলিনীকে প্রতাপের নৌকার ভিতর প্রবেশ করিতে দিবার অনুমতি পাঠাইলেন।

খানসামা আলো আনিয়া দিল। শাস্ত্রী প্রতাপের হাতকড়ি খুলিয়া দিল। খানসামাকে সেই নৌকার উপর আসিতে নিষেধ করিয়া, প্রতাপ আলো লইয়া মিছামিছি ভাত বাড়িতে বসিলেন। অভিপ্রায়—পলায়ন।

শৈবলিনী নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। শাস্ত্রীরা দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিল, নৌকার ভিতর দেখিতে পাইতেছিল না। শৈবলিনী ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রতাপের সম্মুখে গিয়া অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া বসিলেন।

প্রতাপের বিস্ময় অপনীত হইলে দেখিলেন, শৈবলিনী। প্রতাপ মানিলেন, এ বাঘের যোগ্য বাঘিনী বটে!

শৈবলিনী অতি লঘুস্বরে, কানে-কানে বলিলেন, "হাত ধোও—আমি কি ভাতের কাঙ্গাল?"

প্রতাপ হাত ধুইলেন। সেই সময়ে শৈবলিনী কানে-কানে বলিলেন, "এখনও পালাও। বাঁক ফিরিয়া যে ছিপ আছে, সে তোমার জন্য।"

প্রতাপ সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "আগে তুমি যাও। নচেৎ বিপদে পড়িবে।"

শৈ। এইবেলা পালাও। হাতকড়ি দিলে আর পালাইতে পারিবে না। এইবেলা জলে ঝাঁপ দাও। বিলম্ব করিও না। একদিন আমার বুদ্ধিতে চলো, আমি পাগল, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িব। তুমি আমাকে বাঁচাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দাও।

এই বলিয়া শৈবলিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আমি ভাত খাইব না।" তখনই আবার ক্রন্দন করিতে-করিতে বাহির হইয়া বলিলেন, "আমাকে মুসলমানের ভাত খাওয়াইয়াছে—আমার জাত গেল—মা গঙ্গা, ধরিও।" এই বলিয়া শৈবলিনী গঙ্গার স্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন।

"কি হইল? কি হইল?" বলিয়া প্রতাপ চীৎকার করিতে-করিতে নৌকা হইতে বাহির হইলেন। শান্ত্রী সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিষেধ করিতে যাইতেছিল। "হারামজাদা! স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরে, তুমি দাঁড়াইয়া দেখিতেছ?" এই বলিয়া প্রতাপ সিপাহীকে এক পদাঘাত করিলেন। সেই এক পদাঘাতে সিপাহী পান্সী হইতে

পড়িয়া গেল। তীরের দিকে সিপাহী পড়িল। "স্ত্রীলোককে রক্ষা কর" বলিয়া প্রতাপ অপরদিকে জলে ঝাঁপ দিলেন। সন্তরণপটু শৈবলিনী আগে-আগে সাঁতার দিয়া চলিলেন। প্রতাপ তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ সন্তরণ করিয়া চলিলেন।

"কয়েদী ভাগিল" বলিয়া পশ্চাতের শাস্ত্রী ডাকিল এবং প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তখন প্রতাপ সাঁতার দিতেছেন।

প্রতাপ ডাকিয়া বলিলেন, "ভয় নাই—পালাই নাই। এই স্ত্রীলোকটাকে উঠাইব—সম্মুখে স্ত্রীহত্যা কি-প্রকারে দেখিব? তুই বাপু হিন্দু—বুঝিয়া ব্রহ্মহত্যা করিস্।"

সিপাহী বন্দুক নত করিল।

এই সময়ে শৈবলিনী সর্ব্বশেষের নৌকার নিকট দিয়া সন্তরণ করিয়া যাইতেছিলেন। সেখানি দেখিয়া শৈবলিনী অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন যে, যে-নৌকায় শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, এ সেই নৌকা।

শৈবলিনী কম্পিত হইয়া ক্ষণকাল তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তাহার ছাদে জ্যোৎস্নার আলোকে ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর একটি সাহেব অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় রহিয়াছে। শৈবলিনী চীৎকার শব্দ করিলেন, দেখিলেন—পালঙ্কে লরেন্স ফষ্টর।

লরেন্স ফষ্টরও সন্তরণকারিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে-করিতে চিনিল—শৈবলিনী। চীৎকার করিয়া বলিল, "পাক্‌ড়ো! পাক্‌ড়ো! হামারা বিবি।" ফষ্টর শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল, শয্যাগত।

ফষ্টরের শব্দ শুনিয়া চারি-পাঁচজন শৈবলিনীকে ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। প্রতাপ তখন তাহাদিগের অনেক আগে।

তাহারা প্রতাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "পাক্‌ড়ো! পাক্‌ড়ো? ফষ্টর সাহেব ইনাম দেগা!"

প্রতাপ মনে-মনে বলিলেন, "ফষ্টর সাহেবকে আমিও একবার ইনাম দিয়াছি—ইচ্ছা আছে, আর একবার দিব।" প্রকাশ্যে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি ধরিতেছি, তোমরা উঠ।"

এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে ফিরিল। ফষ্টর বুঝে নাই যে, অগ্রবর্ত্তী ব্যক্তি প্রতাপ। ফষ্টরের মস্তিষ্ক তখনও নীরোগ হয় নাই।

———

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অগাধ জলে সাঁতার

দুইজনে সাঁতরাইয়া অনেক দূরে গেলেন। শৈবলিনী কলের পুত্তলির ন্যায় সাঁতার দিতেছিলেন। উভয়ে সন্তরণপটু।

প্রতাপ ডাকিলেন,—"শৈবলিনী—শৈ!"

শৈবলিনী চমকিয়া উঠিলেন,—হৃদয় কম্পিত হইল। বাল্যকালে প্রতাপ তাঁহাকে 'শৈ' বলিয়া ডাকিতেন। আবার সেই প্রিয় সম্বোধন করিলেন। কত কাল পরে!

একখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠ ভাসিয়া যাইতেছিল, শৈবলিনী তাহা ধরিলেন; প্রতাপকে বলিলেন, "ধরো, ভর সইবে। বিশ্রাম করো।" প্রতাপ কাষ্ঠ ধরিলেন; প্রতাপ বলিলেন, "সূর্য্য উঠিয়াছে—শৈ! আর ভয় নাই। কেহ তাড়াইয়া আসিতেছে না।"

শৈ। তবে চলো, তীরে উঠি।

প্র। একটি শপথ করো, তবে আমি উঠিব।

শৈ। কি শপথ, প্রতাপ ?

শৈবলিনী কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার চক্ষে তারা সব নিবিয়া গেল! চন্দ্র কপিশবর্ণ ধারণ করিল। নীলজল নীল অগ্নির মত জ্বলিতে লাগিল। ফষ্টর আসিয়া যেন তরবারিহস্তে দাঁড়াইল। শৈবলিনী রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন, "কি শপথ, প্রতাপ ?"

প্রতাপ। শপথ করো,—আমাকে স্পর্শ করিয়া শপথ করো—আমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী—

শৈ। তোমার শপথ—তুমি যা বলিবে, ইহজন্মে তাহাই আমার স্থির।

প্রতাপ অতি ভয়ানক শপথের কথা বলিলেন। সে শপথ শৈবলিনীর পক্ষে অতিশয় কঠিন, অতিশয় রুক্ষ।

শৈ। আমি শপথ করিব। কিন্তু তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইতেছ। আমি তোমাকে চাহি না। তোমার চিন্তা কেন ছাড়িব ?

প্রতাপ হাত ছাড়িলেন। শৈবলিনী আবার ধরিলেন। তখন অতি গম্ভীর স্বরে শৈবলিনী কথা কহিতে লাগিলেন—বলিলেন,—"প্রতাপ, তোমায় স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি—তোমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শুন, তোমার শপথ! আজি হইতে তোমাকে ভুলিব। আজি হইতেই আমার সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি! আজি হইতে আমি মনকে দমন করিব। আজি হইতে শৈবলিনী মরিল।"

শৈবলিনী প্রতাপের হাত ছাড়িয়া দিলেন—কাষ্ঠ ছাড়িয়া দিলেন।

প্রতাপ গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন, "চলো, তীরে উঠি।"

উভয়ে গিয়া তীরে উঠিলেন।

পদব্রজে গিয়া বাঁক ফিরিলেন। ছিপ নিকটে ছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া ছিপ খুলিয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে কেহ জানিতেন না যে, রমানন্দ স্বামী তাঁহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।

এদিকে ইংরেজের লোক তখন মনে করিল, কয়েদী পলাইল। তাহারা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইল; কিন্তু ছিপ শীঘ্র অদৃশ্য হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রামচরণের মুক্তি

প্রতাপ যদি পলাইলেন, তবে রামচরণের মুক্তি সহজেই ঘটিল। রামচরণ ইংরেজের নৌকায় বন্দিভাবে ছিল না; তাহারই গুলীতে যে ফষ্টরের আঘাত ও শাস্ত্রীর নিপাত ঘটিয়াছিল, তাহা কেহ জানিত না। তাহাকে সামান্য ভৃত্য বিবেচনা করিয়া আমিয়ট মুঙ্গের হইতে যাত্রাকালে ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "তোমার মনিব বড় বদজাত, উহাকে আমরা সাজা দিব, কিন্তু তোমাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" শুনিয়া রামচরণ সেলাম করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আমি চাষা গোয়ালা—কথা জানি না—রাগ করিবেন না—আমার সঙ্গে আপনাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?"

আমিয়টকে কেহ কথা বুঝাইয়া দিলে, আমিয়ট জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রা। নহিলে আমার সঙ্গে তামাসা করিবেন কেন?

আমিয়ট। কি তামাসা ?

রা। আমার পা ভাঙ্গিয়া দিয়া যেখানে ইচ্ছা সেইখানে যাইতে বলায়, বুঝায় যে, আমি আপনাদের বাড়ী বিবাহ করিয়াছি। আমি গোয়ালার ছেলে, ইংরেজের ভগিনী বিবাহ করিলে আমার জাত যাবে।

দ্বিভাষী আমিয়টকে কথা বুঝাইয়া দিলেও তিনি কিছু বুঝিতে পারিলেন না। মনে ভাবিলেন, এ বুঝি একপ্রকার খোসামোদ। মনে করিলেন, যেমন নেটিবেরা খোসামোদ করিয়া 'মা বাপ ভাই' এইরূপ সম্বন্ধসূচক শব্দ ব্যবহার করে, রামচরণ সেইরূপ খোসামোদ করিয়া তাঁহাকে সম্বন্ধী বলিতেছে। আমিয়ট নিতান্ত অপ্রসন্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি চাও কি ?"

রামচরণ বলিল, "আমার পা জোড়া দিয়া দিতে হুকুম হউক।"

আমিয়ট হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি কিছুদিন আমাদিগের সঙ্গে থাক, ঔষধ দিব !"

রামচরণ তাহাই চায়। প্রতাপ বন্দী হইয়া চলিলেন, রামচরণ তাঁহার সঙ্গে থাকিতে চায়। সুতরাং রামচরণ ইচ্ছাপূর্ব্বক আমিয়টের সঙ্গে চলিল। সে কয়েদ রহিল না।

যে-রাত্রে প্রতাপ পলায়ন করিলেন, সেই রাত্রে রামচরণ কাহাকে কিছু না বলিয়া নৌকা হইতে নামিয়া ধীরে-ধীরে চলিয়া গেল। গমনকালে রামচরণ অস্ফুটস্বরে ইণ্ডিলমিণ্ডিলের পিতৃমাতৃভগিনী সম্বন্ধে অনেক নিন্দাসূচক কথা বলিতে-বলিতে গেল। পা জোড়া লাগিয়াছিল।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতোপরি

আজি রাত্রিতে আকাশে চাঁদ উঠিল না। মেঘ আসিয়া চন্দ্র, নক্ষত্র, নীহারিকা, নীলিমা সকল ঢাকিল। মেঘ ছিদ্রশূন্য, অনন্ত-বিস্তারী, জলপূর্ণতার জন্য ধূমবর্ণ;—তাহার তলে অনন্ত অন্ধকার, গাঢ়, অনন্ত সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার, তাহাতে নদী, সৈকত, উপকূল, উপকূলস্থ গিরিশ্রেণী সকল ঢাকিয়াছে; সেই অন্ধকারে শৈবলিনী গিরির উপত্যকায় একাকিনী।

শেষরাত্রে ছিপ তীরে লাগিয়াছিল—বড়-বড় নদীর তীরে নিভৃত স্থানের অভাব নাই—সেইরূপ একটি নিভৃত স্থানে ছিপ লাগাইয়াছিল। সেইসময়ে শৈবলিনী অলক্ষ্যে ছিপ হইতে পলাইয়াছিলেন। এবার শৈবলিনী অসদভিপ্রায়ে পলায়ন করেন নাই। যে ভয়ে দহ্যমান অরণ্য হইতে অরণ্যচর জীব পলায়ন করে, শৈবলিনী সেই ভয়ে প্রতাপের সংসর্গ হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। সুখ, সৌন্দর্য্য, প্রণয়, প্রতাপ, এ-সকলে শৈবলিনীর আর অধিকার নাই—আশা নাই। নিকটে থাকিলে কে আকাঙ্ক্ষা পরিহার করিতে পারে?

শৈবলিনী যুদ্ধে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। মনে তাঁহার ভয় ছিল, প্রতাপ তাঁহার পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেই তাঁহার সন্ধান করিবে। এজন্য নিকটে কোথাও অবস্থিতি না করিয়া যতদূর পারিলেন, ততদূর চলিলেন। ভারতবর্ষের কটিবন্ধ-স্বরূপ যে গিরিশ্রেণী, অদূরে তাহা দেখিতে পাইলেন। গিরি আরোহণ করিলে, পাছে অনুসন্ধান-প্রবৃত্ত কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায়, এজন্য দিবাভাগে গিরি আরোহণে প্রবৃত্ত

হইলেন না। বনমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। সমস্ত দিন অনাহারে গেল, সায়াহ্নকাল অতীত হইল, প্রথম অন্ধকার, পরে জ্যোৎস্না উঠিবে। শৈবলিনী অন্ধকারে গিরি-আরোহণ আরম্ভ করিলেন। অন্ধকারে শিলাখণ্ডসকলের আঘাতে পদদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। তাহার ক্ষুদ্র লতা-গুল্মমধ্যে পথ পাওয়া যায় না; তাহার কণ্টকে, ভগ্ন শাখাগ্রভাগের বা মূলবিশেষের অগ্রভাগে হস্তপদাদি সকল ছিঁড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।

তাহাতে শৈবলিনীর দুঃখ হইল না। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী এ প্রায়শ্চিত্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাক্রমে শৈবলিনী সুখময় সংসার ত্যাগ করিয়া এ ভীষণ কণ্টকময় হিংস্রজন্তু-পরিবৃত পর্ব্বতারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এতকাল ঘোরতর পাপে নিমগ্ন হইয়াছিলেন—এখন দুঃখভোগ করিলে কি সে পাপের কোন উপশম হইবে?

অতএব ক্ষতবিক্ষত-চরণে শোণিতাক্ত কলেবরে ক্ষুধার্ত্ত পিপাসা-পীড়িত হইয়া শৈবলিনী গিরি-আরোহণ করিতে লাগিলেন। পথ নাই—শৈবলিনী বহুকষ্টে অল্পদূর মাত্র আরোহণ করিলেন। এমন সময় ঘোরতর মেঘাড়ম্বর করিয়া আসিল। অন্ধকারের উপর অন্ধকার নামিয়া গিরিশ্রেণী, বনরাজি, দূরস্থ নদী সকল ঢাকিয়া ফেলিল,—শৈবলিনীর বোধ হইতে লাগিল, জগতে প্রস্তর, কণ্টক এবং অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নাই। আর পর্ব্বতারোহণ-চেষ্টা বৃথা। শৈবলিনী হতাশ হইয়া সেই কণ্টকবনে উপবেশন করিলেন।

আকাশের মধ্যস্থল হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত, সীমান্ত হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল! অতি ভয়ঙ্কর! সঙ্গে-সঙ্গে অতি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন আরম্ভ হইল।

অঙ্গে কিসের শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। এক বিন্দু বৃষ্টি। ফোঁটা, ফোঁটা, ফোঁটা! তারপর দিগন্তব্যাপী গর্জ্জন। সে-গর্জ্জন বৃষ্টির, বায়ুর এবং মেঘের; তৎসঙ্গে কোথাও বৃক্ষশাখাভঙ্গের শব্দ, কোথাও ভীত পশুর চীৎকার, কোথাও স্থানচ্যুত উপলখণ্ডের অবতরণ শব্দ। দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল। অবনত-মস্তকে পার্ব্বতীয় প্রস্তরাসনে শৈবলিনী বসিয়া;—অনেক পরে বৃষ্টি থামিল। ঝড় থামিল না, কেবল মন্দীভূত হইল মাত্র। অন্ধকার যেন গাঢ়তর হইল।

শৈবলিনী বুঝিলেন যে, জলসিক্ত পিচ্ছিল পর্ব্বতে আরোহণ, অবতরণ উভয়ই অসাধ্য। শৈবলিনী সেইখানে বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার গার্হস্থ্য-সুখপূর্ণ বেদগ্রামে পতিগৃহ স্মরণ হইতেছিল। মনে হইতেছিল যে, যদি আর-একবার সে সুখাগার দেখিয়া মরিতে পারি, তবুও সুখে মরিব! কিন্তু তাহা দূরে থাকুক—বুঝি আর সূর্য্যোদয়ও দেখিতে পাইব না। পুনঃপুনঃ যে মৃত্যুকে ডাকিয়াছি, অদ্য সে নিকট। এমন সময় সেই মনুষ্যশূন্য পর্ব্বতে, সেই অগম্য বনমধ্যে, সেই মহাঘোর অন্ধকারে কোন মনুষ্য শৈবলিনীর গায়ে হাত দিল।

শৈবলিনী প্রথমে মনে করিলেন, কোন বন্য পশু। শৈবলিনী সরিয়া বসিলেন। কিন্তু আবার সেই হস্তস্পর্শ—স্পষ্ট মনুষ্য-হস্তের স্পর্শ—অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শৈবলিনী ভয়বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "তুমি কে? দেবতা, না মনুষ্য?" মনুষ্য হইতে শৈবলিনীর ভয় নাই—কিন্তু দেবতা হইতে ভয় আছে, কেন না, দেবতা দণ্ডবিধাতা।

কেহ কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শৈবলিনী বুঝিলেন যে,

মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাঁহাকে দুই হাত দিয়া ধরিতেছে। শৈবলিনী উষ্ণ নিশ্বাসস্পর্শ স্কন্ধদেশে অনুভূত করিলেন। দেখিলেন, এক ভুজ শৈবলিনীর পৃষ্ঠদেশে স্থাপিত হইল—আর এক হস্তে শৈবলিনীর দুই পদ একত্র করিয়া বেড়িয়া ধরিল। শৈবলিনী দেখিলেন, তাঁহাকে উঠাইতেছে। শৈবলিনী একটু চীৎকার করিলেন —বুঝিলেন যে, মনুষ্য হউক, দেবতা হউক, তাঁহাকে ভুজোপরি উত্থিত করিয়া কোথায় লইয়া যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে অনুভূত হইল যে, সে শৈবলিনীকে ক্রোড়ে লইয়া সাবধানে পর্ব্বতারোহণ করিতেছে। শৈবলিনী ভাবিলেন যে, এ যেই হউক, লরেন্স ফষ্টর নহে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্ত—প্রতাপ কি করিলেন ?

প্রতাপ জমিদার এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সে-সময় অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন।

তবে অন্যান্য প্রাচীন জমিদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তিরক্ষার জন্য, বা দুর্দ্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না ; এমন কি, দুর্ব্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে

রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। প্রতাপ আবার সেই পথে গমনোদ্যত হইলেন।

যে-রাত্রে শৈবলিনী ছিপ ত্যাগ করিয়া পলাইলেন, সেই রাত্রি প্রভাতে প্রতাপ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, রামচরণ আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন; কিন্তু শৈবলিনীকে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কিছুকাল তাঁহার প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহাকে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, নিরাশ হইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শৈবলিনী ডুবিয়া মরিয়াছেন। প্রতাপ জানিতেন, এখন তাঁহার ডুবিয়া মরা অসম্ভব নহে।

প্রতাপ প্রথমে মনে করিলেন, "আমিই শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ।" কিন্তু ইহাও ভাবিলেন, "আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম পথে যাই নাই।" অতএব প্রতাপ নিজের উপর রাগ করিবার কারণ পাইলেন না। সর্ব্বাপেক্ষা লরেন্স ফষ্টরের উপর রাগ হইল—সে শৈবলিনীকে গৃহত্যাগিনী না করিলে, এ-সকল কিছুই ঘটিত না। ইংরেজ-জাতি বাঙলায় না আসিলে শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়িতেন না। অতএব ইংরেজ-জাতির উপর প্রতাপের অনিবার্য্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন, ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া, এবার অগ্নিসৎকার করিতে হইবে; দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ-জাতিকে বাঙলা হইতে উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। কেন না, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।

এইরূপ চিন্তা করিতে-করিতে প্রতাপ সেই ছিপে মুঙ্গের ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপ দুর্গমধ্যে গেলেন। দেখিলেন, ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হইবে, তাহার উদ্যোগের বড় ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

প্রতাপের আহ্লাদ হইল। মনে ভাবিলেন, নবাব কি এই অসুরদিগকে বাঙলা হইতে তাড়াইতে পারিবেন না? ফষ্টর কি ধৃত হইবে না? তারপর ভাবিলেন, যাহার যেমন শক্তি, তাহার কর্ত্তব্য এই কার্য্যে নবাবের সাহায্য করা। কাষ্ঠবিড়ালেও সমুদ্র বাঁধিতে পারে।

তারপর মনে ভাবিলেন, আমা হইতে কি কোন সাহায্য হইতে পারে না?

ভাবিলেন, আর কোন কার্য্য না হউক, লুটপাট হইতে পারে। যে গ্রাম ইংরেজের সাহায্য করিবে, সে গ্রাম লুঠ করিতে পারিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের রসদ লইয়া যাইতেছে, সেইখানেই রসদ লুঠ করিব। যেখানে দেখিব, ইংরেজের দ্রব্যসামগ্রী যাইতেছে, সেইখানেই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিব। ইহা করিলেও নবাবের অনেক উপকার করিতে পারিব। সম্মুখ-সংগ্রামে যে জয়, তাহা বিপক্ষ-বিনাশের সামান্য উপায়-মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠরোধ এবং খাদ্যাহরণের ব্যাঘাত, প্রধান উপায়। যতদূর পারি, ততদূর তাহা করিব।

প্রতাপ তখন অমাত্যবর্গের খোসামোদ করিয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অনেক দিনের পর, তাঁহার স্বদেশ আগমনে রূপসীর গুরুতর চিন্তা দূর হইল। কিন্তু শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রূপসী দুঃখিত হইলেন। প্রতাপ আসিয়াছেন শুনিয়া সুন্দরী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। সুন্দরীও শৈবলিনীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

প্রতাপ রূপসী ও সুন্দরীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর পুনর্ব্বার গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন। অচিরাৎ দেশে-দেশে রাষ্ট্র হইল যে, মুঙ্গের হইতে কাটোয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় দস্যু ও লাঠিয়াল দলবদ্ধ হইতেছে, প্রতাপ রায় তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিতেছেন।

শুনিয়া গুর্‌গন্ খাঁ চিন্তাযুক্ত হইলেন।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শৈবলিনী কি করিলেন?

মহান্ধকারময় পর্ব্বতগুহা—উপল-শয্যায় শুইয়া শৈবলিনী। মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীকে তথায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে—কিন্তু গুহামধ্যে অন্ধকার—কেবল অন্ধকার—অন্ধকারে ঘোরতর নিঃশব্দ! নয়ন মুদিলে অন্ধকার—চক্ষু চাহিলে তেমনই অন্ধকার। নিঃশব্দ—কেবল কোথাও পর্ব্বতস্থ রন্ধ্র-পথে বিন্দু-বিন্দু বারি গুহাতলস্থ শিলার উপরে পড়িয়া ক্ষণে-ক্ষণে টিপ্-টিপ্ শব্দ করিতেছে। আর যেন কোন জীব, মনুষ্য কি পশু কে জানে!—সেই গুহামধ্যে নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

এতক্ষণে শৈবলিনী ভয়ের বশীভূতা হইলেন। তাহার পর এই ভীষণ দৈব ব্যাপার—দৈব বলিয়াই শৈবলিনীর বোধ হইল—মানসচিত্ত আর কতক্ষণ প্রকৃতিস্থ থাকে? দেহ ভাঙিয়া পড়িল, মন ভাঙিয়া পড়িল—শৈবলিনী অপহৃতচেতনা হইয়া অর্দ্ধনিদ্রাভিভূত, অর্দ্ধজাগ্রদবস্থায় রহিলেন।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্য বিলুপ্ত হইলে শৈবলিনী দেখিলেন, সম্মুখে

এক অনন্তবিস্তৃতা নদী। কিন্তু নদীতে জল নাই—দুই কূল প্লাবিত করিয়া রুধিরের স্রোত বহিতেছে। তাহাতে অস্থিগলিত নরদেহ, নৃমুণ্ড, কঙ্কালাদি ভাসিতেছে। কুম্ভীরাকৃতি জীবসকল—ইতস্তত বিচরণ করিয়া, সেইসকল গলিত শব ধরিয়া খাইতেছে। শৈবলিনী দেখিলেন যে, যে মহাকায় পুরুষ তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে ধৃত করিয়া আনিয়াছেন, তিনি আবার ধৃত করিয়া তাঁহাকে সেই নদীতীরে আনিয়া বসাইলেন। সে প্রদেশে রৌদ্র নাই, জ্যোৎস্না নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আলোকমাত্র নাই, অথচ অন্ধকার নাই। সকলই দেখা যাইতেছে—কিন্তু অস্পষ্ট। রুধিরের নদী, গলিত শব, কঙ্কাল-মালা, অস্থিময় কুম্ভীরগণ সকলই ভীষণান্ধকারে দেখা যাইতেছে। শৈবলিনীকে মহাকায় পুরুষ সেইখানে বসাইয়া নদী পার হইতে বলিলেন। পারের কোন উপায় নাই। নৌকা নাই, সেতু নাই। মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "সাঁতার দিয়া পার হ, তুই সাঁতার জানিস্—গঙ্গায় প্রতাপের সঙ্গে অনেক সাঁতার দিয়াছিস্।"

শৈবলিনী এই রুধিরের নদীতে কি-প্রকারে সাঁতার দিবেন? মহাকায় পুরুষ তখন হস্তস্থিত বেত্র প্রহার জন্য উত্থিত করিলেন। শৈবলিনী সভয়ে দেখিলেন যে, সেই বেত্র জ্বলন্ত লোহিত লৌহ-নির্ম্মিত। শৈবলিনীর বিলম্ব দেখিয়া মহাকায় পুরুষ শৈবলিনীর পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহারে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শৈবলিনী প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া রুধিরের নদীতে ঝাঁপ দিলেন। অমনি অস্থিময় কুম্ভীর-সকল তাঁহাকে ধরিতে আসিল, শৈবলিনী তখন চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রক্ষা করো! এ নরক। এখান হইতে উদ্ধারের কি উপায় নাই?"

মহাকায় পুরুষ বলিলেন, "আছে।"

স্বপ্নাবস্থায় আত্মকৃত চীৎকারে শৈবলিনীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখনও ভ্রান্তি যায় নাই—পৃষ্ঠে প্রস্তর ফুটিতেছে। শৈবলিনী ভ্রান্তিবশে জাগ্রতেও ডাকিয়া বলিলেন, "আমার কি হবে? আমার উদ্ধারের উপায় কি নাই?"

গুহামধ্য হইতে গম্ভীর শব্দ হইল, "আছে।"

এ কি এ? শৈবলিনী কি সত্য-সত্যই নরকে? শৈবলিনী বিস্মিত, বিমুগ্ধ, ভীত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়?"

গুহামধ্য হইতে উত্তর হইল, "দ্বাদশবার্ষিক ব্রত অবলম্বন কর।"

এ কি, দৈববাণী? শৈবলিনী কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কি সে ব্রত? কে আমায় শিখাইবে?"

উত্তর। আমি শিখাইব।

শৈব। তুমি কে?

উত্তর। ব্রত গ্রহণ কর।

শৈব। কি করিব?

উত্তর। তোমার ও চীরবাস ত্যাগ করিয়া আমি যে বসন দিই, তাই পর। হাত বাড়াও।

শৈবলিনী হাত বাড়াইলেন। প্রসারিত হস্তের উপর একখণ্ড বস্ত্র স্থাপিত হইল। শৈবলিনী তাহা পরিধান করিয়া, পূর্ব্ববস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি করিব?"

উত্তর। তোমার শ্বশুরালয় কোথায়?

শৈব। বেদগ্রাম। সেখানে কি যাইতে হইবে?

উত্তর। হ্যাঁ, গিয়া গ্রামপ্রান্তে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিবে।

শৈব। আর ?

উত্তর। ভূতলে শয়ন করিবে।

শৈব। আর ?

উত্তর। ফলমূল পত্র ভিন্ন ভোজন করিবে না। একবার ভিন্ন খাইবে না।

শৈব। আর ?

উত্তর। জটাধারণ করিবে।

শৈব। আর ?

উত্তর। একবার মাত্র দিনান্তে গ্রামে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিবে। ভিক্ষাকালে গ্রামে-গ্রামে আপনার পাপ কীর্ত্তন করিবে।

শৈব। আমার পাপ যে বলিবার নয়! আর কি প্রায়শ্চিত্ত নাই ?

উত্তর। আছে।

শৈব। কি ?

উত্তর। মরণ।

শৈব। ব্রত গ্রহণ করিলাম—আপনি কে ?

শৈবলিনী কোন উত্তর পাইলেন না। তখন শৈবলিনী সকাতরে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যেই হউন জানিতে চাহি না। পর্ব্বতের দেবতা মনে করিয়া আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনি আর-একটি কথার উত্তর করুন, আমার স্বামী কোথায় ?"

উত্তর। কেন ?

শৈব। আর কি তাঁহার দর্শন পাইব না ?

উত্তর। তোমার প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত হইলে পাইবে।

শৈব। দ্বাদশ বৎসর পরে ?

উত্তর। দ্বাদশ বৎসর পরে।

শৈব। এ প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া কতদিন বাঁচিব ? যদি দ্বাদশ বৎসর মধ্যে মরিয়া যাই ?

উত্তর। তবে মৃত্যুকালে সাক্ষাৎ পাইবে।

শৈব। কোন উপায়ে কি তৎপূর্ব্বে সাক্ষাৎ পাইব না ? আপনি দেবতা, অবশ্য জানেন।

উত্তর। যদি এখন তাঁহাকে দেখিতে চাও, তবে সপ্তাহকাল দিবারাত্র এই গুহামধ্যে একাকিনী বাস কর। এই সপ্তাহ দিন-রাত কেবল স্বামীকে মনোমধ্যে চিন্তা কর—অন্য কোন চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিও না। এই সাত দিন কেবল একবার সন্ধ্যাকালে নির্গত হইয়া ফলমূলাহরণ করিও ; তাহাতে পরিতোষজনক ভোজন করিও না—যেন ক্ষুধা নিবারণ না হয়। কোন মনুষ্যের নিকট যাইও না, বা, কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কথা কহিও না। যদি অন্ধকার গুহায় সপ্তাহ অবস্থিতি করিয়া সরলচিত্তে অবিরত অনন্যমন হইয়া কেবল স্বামীর ধ্যান কর, তবে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাতাস উঠিল

শৈবলিনী তাহাই করিলেন—সপ্তদিবস গুহা হইতে বাহির হইলেন না—কেবল একবার দিনান্তে ফলমূলান্বেষণে বাহির হইলেন। সাত দিন মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ করিলেন না। প্রায় অনশনেই

বিকটান্ধকারে স্বামীর চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিছু দেখিতে পান না, কিছু শুনিতে পান না, কিছু স্পর্শ করিতে পান না। অন্ধকারে আর কিছু দেখিতে পান না—সাত দিন, সাত রাত কেবল স্বামিমুখ দেখিলেন।

যে-বিষয়ে চিত্ত স্থির করা যায়, তাহাই জপ করিতে-করিতে চিত্ত তন্ময় হইয়া উঠে। শৈবলিনীর চিত্তে চিরপ্রবাহিত নদী ফিরিল, পাহাড় ভাঙিল, সমুদ্র শোষিল, বায়ু স্তম্ভিত হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলিয়া চন্দ্রশেখরকে ভালবাসিলেন।

মনুষ্যের ইন্দ্রিয়ের পথ রোধ কর—ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর—মনকে বাঁধ—বাঁধিয়া একটি পথে ছাড়িয়া দাও—অন্য পথ বন্ধ কর—মনের শক্তি অপহৃত কর—মন কি করিবে? সেই এক পথে যাইবে—তাহাতে স্থির হইবে—তাহাতে মজিবে। শৈবলিনী পঞ্চম দিবসে আহরিত ফলমূল খাইলেন না—ষষ্ঠ দিবস ফল-মূল আহরণে গেলেন না—সপ্তম দিবসে প্রাতে ভাবিলেন, স্বামি-দর্শন পাই না-পাই—অদ্য মরিব। সপ্তম রাত্রে মনে করিলেন, হৃদয়মধ্যে পদ্মফুল ফুটিয়াছে—তাহাতে চন্দ্রশেখর যোগাসনে বসিয়া আছেন, শৈবলিনী ভ্রমর হইয়া পাদপদ্মে গুন্-গুন্ করিতেছেন।

সপ্তম রাত্রে সেই অন্ধকার নীরব শিলাকর্কশ গুহামধ্যে, একাকী স্বামি-ধ্যান করিতে-করিতে শৈবলিনী চেতনা হারাইলেন। তিনি নানা বিষয়ে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে সজ্ঞানমৃতা শৈবলিনী দূরে নরক দেখিতে পাইলেন। তাহার পরেই তাঁহার চক্ষু অন্ধ, কর্ণ বধির হইল; তখন তিনি মনে-মনে চন্দ্রশেখরের ধ্যান করিতে লাগিলেন—"কোথায় তুমি স্বামি! কোথায় প্রভু! আমি নরককুণ্ডে পতিত হইতেছি, তুমি প্রসন্ন হও—আমায় রক্ষা কর।"

…তবে মর।” এই বলিয়া পাঠান তরবারির আঘাতে আমিয়টের মুণ্ড চিরিয়া ফেলিল। [পৃষ্ঠা—৯০